নষ্ট মেয়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

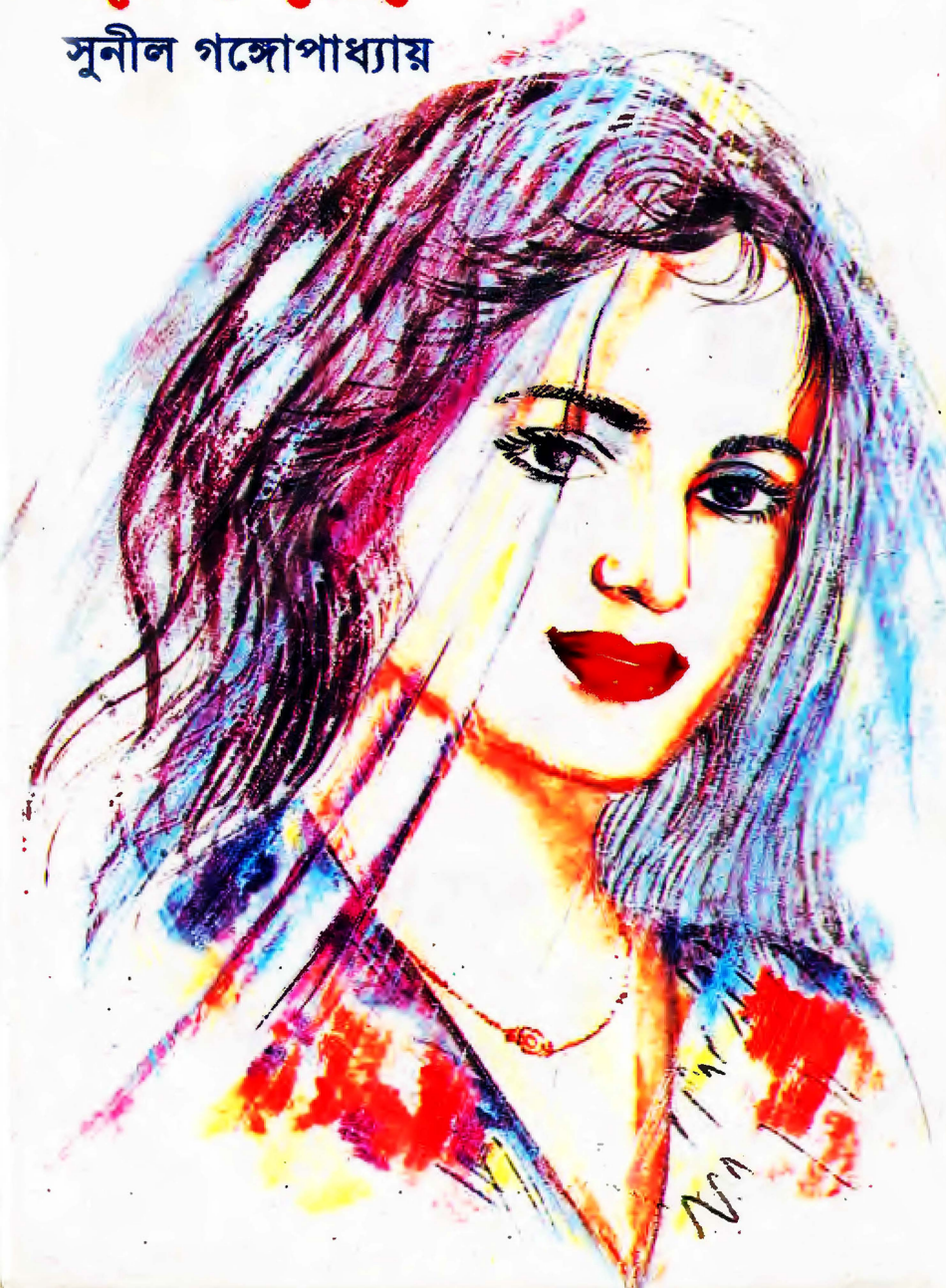

নষ্ট মেয়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশনায়
মৌচাক প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায় ঃ
ফজলুল হক সওদাগর
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদঃ কালার ডট্‌স।
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ৯৮ ইং

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ এম, আর, প্রিন্টার্স
১০, কাগজী টোলা, ঢাকা-১১০০

না কোন লজ্জা নেই, সম্ভ্রমের বালাই নয়, কাউকে পরোয়া করে না। সবাই জানে, কমল অসূর্যম্পশ্যা বধূ নয়। ঘোমটার আবরণে পৃথিবী ঢেকে আড়াল খোঁজে না। নিজের জীবন নিয়ে, জীবিকা নিয়ে কোন লুকোচুরি তার ধাতে সয় না।

সে যা তাই।

বারবধূ। তার দেহ হাজার মাংসলোভী মানুষের খাদ্য।

এরা কেউ তার মনের দিকে দেখে না। কখনও দেখে নি।

এই কীটদষ্ট দেহ ঘিরেই তাদের মত্ত উল্লাস, অবশ্য যতদিন তারা কীটদষ্ট হবার সংবাদ না পায়।

অথচ এরা কেউ আজ বিশ্বাস করবে না, একদিন কমলের লজ্জা ছিল, সম্ভ্রম ছিল, সংসার ছিল।

আজকের মতন রাতের সংসার নয়, জীবনের আশ্রয়, জুড়াবার আস্তানা। তা সে যত অল্পদিনের জন্যই হোক।

একদিন জানালার পর্দার অন্তরাল থেকে কমল রাস্তার চেহারা দেখেছে, আর আজ পথ তার সঙ্গী, পথের জীবন তার একমাত্র অবলম্বন।

আজ দেশলাই জ্বেলে পথিক দেহ যাচাই করে, রূপের ঠিকানা খোঁজে।

কিন্তু একদিন তুলসীতলায় রাখা প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় কমলের মুখ দেখা যেত। আজ সবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

হবেই। কমলেরই মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিনের কমল আর আজকের কমল কি এক?

কমলের এই ধূলিধূসরিত রূপের জন্য কে দায়ী? কে তাকে ঘরের আঙ্গিনা থেকে পথের ধূলায় টেনে এনেছে? শকুনি গৃধিনী আর সারমেয়র ভোজ্য করেছে।

এসব কথা শোনাবার কারো সময় নেই।

এসব ছল ছুতো করে ইদানীং তাকে এড়িয়ে চলে।

একদিন যে ছলনা কমলের জীবনের জীবিকার শ্রেষ্ঠ সম্বল ছিল, আজ সে ছলনার জালেই তাকে প্রতারিত হতে হয়।

এখন কমলের প্রচুর অবসর। এই নিরন্ধ্র অন্ধকারে তার সারা জীবনের ছবিটা যেন প্রকট হয়ে উঠে। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে।

শুনবে আমার জীবনী? কোথা থেকে আমি কোথায় এসেছি? কতটুকু আর সময় নেব। শোন না।

তারপর গান বাজনা ইয়ার্কি ঠাট্টা সব হবে।

পয়সা যখন দিয়েছ তখন ছাড়বেই বা কেন?

এই দু'ঘন্টা তো কমল তোমার বাঁদী। বাঁদীর একটা অনুরোধ রাখ না।

স্টেশনের নাম রোশনপুর। কিন্তু স্টেশন থেকে অনেক দূর।

রোশনপুর স্টেশনের সামনে বিরাট বটগাছ। তার তলায় নানা আকারের বাসের জটলা। চীৎকারে জায়গাটা সরগরম।

যে বাসের কন্ডাকটর গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে। বাদামতলা, বাঁকাপাতি, রহিমপুর। এখনই ছাড়বে। উঠে পড়। উঠে পড়।

সেই বাসে উঠে পড়বে। হাতে যদি পোঁটলা থাকে, খুব সাবধান। নজর রেখ, নাহলে বেহাত হয়ে যাবে।

এ স্টেশনে চোরের রাজত্ব।

বাঁকাপাতি ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক। গাঁয়ের নাম মোহনগাছি।

বেশ মিষ্টি নাম, তাই না?

শীতলাতলায় বাস থামে। খুব অল্পক্ষণের জন্য।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়বে।
শীতলাতলার পাশেই মজা দীঘি। তার ধারে পায়ে চলা পথ।
লোক চলে চলে ঘাসের চিহ্ন আর নেই।
সেই রাস্তা ধরে সোজা চলে আসবে। মাইল খানেক তো বটেই।
রথতলায় মাঠ আছে, ভাঙা, বিবর্ণ একটা রথও দেখবে সেখানে।
সেটা পার হয়ে আবিষ্কার করবে পথ আর নেই।
তখন কাউকে বরং জিজ্ঞাসা ক'রো।
ভৈরব মাস্টারের বাড়িটা কোথায়?
নামটা যত ভয়াবহ, মানুষটা কিন্তু সেরকম নয়।
দরিদ্র স্কুল মাস্টার। বেতন যা পায়, তাতে অর্ধেক দিনও চলে না। আছে। লোক নিয়ে চাস করায়। তারই আয়ে কোনরকমে চলে।
তাও আবার অনাবৃষ্টি আছে, অতিবৃষ্টি আছে, তখন ধার।
কিন্তু এত ধার মাস্টারকে দেবে কে?
কিসের আশায়?
দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলেরা বড়। দুজনেই শহরে।
একজন অফিসে, একজন কারখানায়।
আগে বছরে একখানা করে চিঠি দিত, বিজয়ার পর। ইদানীং তাও বন্ধ।
ভৈরব মাস্টার বড় মেয়ের বিয়েতে ছেলেদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।
সেই অপরাধে যোগাযোগ বন্ধ।
বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, ক্ষেত বিক্রী করে। জামাই জঙ্গীপুরের বাসিন্দা।
জঙ্গীপুরের লাট বললেই বোধ হয় সমীচিন হত।
সরকারি অফিসে কাজ করে। প্রায় বড়বাবু।
দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল না খাক, কেরানীকুল তটস্থ।
গায়ের বর্ণ অমাবস্যা রাতের মতন, দু'চোখ জবাফুলের রঙ। গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় নাট-মন্দিরে কাঁসর বাজছে।
বড় মেয়ে চাঁপার যখন বিয়ে হল, তখন ছোট মেয়ে কমলের বয়স তেরো। মা নেই, সম্বল এক পিসিমা। তাও সে মাসের অর্ধেক দিন শয্যাগত। বাতে। কমলের ইচ্ছা ছিল দিদির সঙ্গে তার শ্বশুরবড়ি যাবে, কিন্তু জামাই স্পষ্টই বলে দিল, ওসব ঝামেলা আমার সহ্য হয় না। কে আবার দিতে আসবে।
মেজাজ দেখে আটদিন পরে দ্বিরাগমনের কথা কেউ বলল না।
দুবছর বাদে জামাই ফিরল। মেয়ে নয়।
উঠানে পামসু খুলে রকের ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে জামাই বলেছিল। খুব মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে ছিলেন। এত কমজোরি মেয়ে আগে বলতে হয়?
বিয়োতে গিয়ে টেঁসে গেল।
ভৈরব মাস্টার কোন উত্তর দেয় নি। কোন উত্তর তার জানা ছিল না।
সেই সময় কমল গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাতে গ্লাসে ডাবের জল।
বয়সের চেয়েও বাড়ন্ত গড়ন। শাড়িতে যৌবন ঢাকা দুষ্কর।
চেহারা দেখে কে বলবে, অর্ধভুক্ত, দারিদ্র-নির্ভর মেয়ে।
সেই প্রথম কাম-কলুষিত দৃষ্টির স্বরূপ দেখল কমল।
জামাই দৃষ্টি দিয়ে লেহন করতে লাগল।
কোন রকমে শাড়ি দিয়ে দেহ ঢেকে ডাবের জলটা রেখেই কমল ভিতরে ঢুকল।
হৃদস্পন্দন দ্রুততর মনে হল যেন নগ্ন দেহ কেউ দেখে ফেলেছে।

ঠিক সেই রকম হয়েছিল আর একবার।
রায়েদের পুকুর থেকে কমল স্নান করে উঠল।
খাঁ খাঁ দুপুর। কেউ কোথাও নেই। কারো থাকবার কথাও নয়।
তবু এদিক ওদিক চেয়ে ভিজে শাড়ি কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিল। ব্লাউজটা মাথায় গালাতে গিয়েই বিপত্তি। পাশের ঝোপে খস্ খস্ শব্দ।
নিশ্চয় কেউ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। পাড়ার কোন বদমাইশ ছেলে।
ব্লাউজটা পরার পরই ভুল বুঝতে পারল। মানুষ নয়, কুকুর।
দাবদাহে ক্লান্ত হয়ে কুকুরটা ঝোপের ছায়ায় বিশ্রাম করছিল।
ওটা যে মানুষ নয় কুকুর, সেটা জানবার পরও কমলের বুঝের দপদপানি থামে নি।
আজও ঠিক সেই রকম।
ভিতরে ঢুকল বটে কিন্তু দরজার কাছ থেকে সরে নি।
তার নামটা কানে গেছে। জামাইয়ের গলা।
কমলি না?
ভৈরব উত্তর দিল।
হ্যাঁ।
বেশ ডাগর হয়ে গেছে। বিয়ে থার কি করছেন?
কি আর করব! গরিবের মেয়েকে আর কে বিয়ে করবে?
কত বয়স হল?
তা পনের হবে।
পনের? সত্যি বলছেন? দেখতে তো বিশ বছরের মাগীর মতন।
ভৈরব মাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
বোধ হয় জামাইয়ের কুরুচিপূর্ণ কথাগুলো হজম করতে সময় লাগল।
আচ্ছা আমি দেখি চেষ্টা করে।
বিগলিত ভৈরব মাস্টার জামাইয়ের দুটো হাত আঁকড়ে ধরেছিল।
দেখ বাবা। তুমি আপনজন। যদি দায়োদ্ধার করতে পার।
জামাই দুদিন ছিল। এই দুদিনে কমলের প্রাণান্তকর অবস্থা।
দুপুরবেলা পিসির পাশে মাদুরে শুয়ে আছে। বেসামাল অবস্থায়।
জামাই এসে চৌকাঠে দাঁড়াল।
কমল, একটা পান খাওয়াতে পার?
চমকে উঠে কমল তাড়াতাড়ি বুকের ওপর আঁচল টেনে দিল।
লজ্জা নম্র কণ্ঠে বলল।
আপনি একটু বসুন জামাইবাবু। আমি নিয়ে যাচ্ছি।
নিয়ে যেতে এমন বিপত্তি হবে যদি বুঝতে পারত কমল।
পানের খিলি হাতে নিয়ে এদিকের ঘরে এসে কমল দেখল, জামাই তক্তপোষে শুয়ে। হাত পাখা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে।
এই নিন। পানসুদ্ধ হাতটা কমল প্রসারিত করে দিল।
হাতপাখাটা পাশে রেখে জামাই হাত বাড়িয়ে কমলের একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। একেবারে আচমকা।
এর জন্য কমল একেবারেই তৈরি ছিল না।
সে জামাইয়ের বুকের ওপর এসে পড়ল।
পলকের মধ্যে লোমশ স্থূল দুটি বাহুর বাঁধনে বন্দী হল।
আমের আচার খেতে গিয়ে ঠিক এমনই জ্বালা।
আচারে বোধ হয় পিঁপড়ে ছিল। ফুলে উঠেছিল দুটো ঠোঁট। ঠিক তেমনই।
কিন্তু সেদিন শুধু দুটো ঠোঁটেই যন্ত্রণা হয়েছিল, কিন্তু আজ মনে হল রক্তের সমুদ্রে যেন বান ডাকল। শিরায় শিরায় অসহ্য একটা দাহ।
ঠোঁটদুটো আঁচলে ঢেকে কমল পিসির কাছে চলে এসেছিল।

কি ভাগ্য, পিসি ঘুমে অচেতন।
একটি কিশোরীর দেহে এবং মনে কি রূপান্তর ঘটল, তা জানতেও পারল না।
কমল কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ল।
তার মনে হল, সে যেন অশুচি হয়ে গেছে। তার কুমারীজীবন কলঙ্কিত।
জামাই চলে যাবার পর ভৈরব মাস্টার আর পিসির মধ্যে ফিসফিসানি আরম্ভ হল।
এ কানাকানির লক্ষ্য যে কমল সেটা বুঝতে তার একটু দেরী হল না।
দু-একটা উড়ো কথাও কানে এল। পিসির গলা।
তুই আর অমত করিস নি ভৈরব। এ রকম ছেলে তুই পাবি কোথায়? একটু বয়স হয়েছে এই যা, কিন্তু পুরুষ মানুষের আবার বয়স।
তবু ভৈরব আপত্তি করেছে।
বড় মেয়েটা ওইরকমভাবে গেল। আবার ওই ঘরেই ছোট মেয়েটাকে দেব?
পরমায়ু কি কেউ কাউকে দিতে পারে? সবাই নিজের বরাত নিয়ে জন্মায়। তুই কি করবি।
কমলের প্রথমে মনে হল সামনের পৃথিবী দ্রুতবেগে আবর্তিত হচ্ছে। পায়ের তলার মাটিটুকুও থরথরিয়ে কাঁপছে।
তার জীবনটা জামাইবাবুর জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বাঁধবার ষড়যন্ত্র চলছে তা হলে!
এ ব্যাপারে তার কোন বক্তব্য নেই। তার বক্তব্য কেউ শুনবেও না। পুরোহিত নিজে যেখানে ছাগশিশুকে টেনে হাঁড়িকাঠের আওতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে পরিত্রাণ কোথায়!
বিয়ে হয়ে গেল।
কোন রকম ধুমধাম নয়। বাজনাবাদ্যি না। নমোঃ নমোঃ করে অনুষ্ঠান সারা।
তারপর যাত্রা শুরু।
কমল বাপকে জড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল।
তার কেমন মনে হয়েছিল, এই শেষ যাত্রা।
দিদির মতন সেও আর বাপের কাছে ফিরে আসবে না।
গরুর গাড়িতে প্রথম কথা।
ছইয়ে মাথা রেখে কমল ঝিমোচ্ছিল, পাশে বর।
দুজনের গলায় শুকনো বেলফুলের মালা।
আচমকা একটা হাত উরুতে পড়তে কমল চমকে উঠল।
বরের নাম বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। চোখ চেয়ে হেসে বলল।
গাঁ ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে তো?
এর উত্তরটা এত সাধারণ যে কমল উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না।
শুধু জলভরা চোখ মেলে দেখতে লাগল।
লোকটার সামনের দুটো দাঁত পোকায় খাওয়া। ঠোঁট কালো, পুরু। কপালের কাছে চিড়িতনের ঢংয়ে একটা কাটা দাগ।
এখানে কটা নাং ছিল?
প্রশ্নটা কমল শুনতে পেল, কিন্তু বুঝতে পারল না।
বুঝতে যে পারে নি, সেটা বোধ হয় তার মুখ চোখের ভঙ্গিতেই ফুটে উঠেছিল।
বিশু আবার বলল।
নাং কথাটার মানে বুঝলে না?
কমল মাথা নাড়ল। না, বোঝে নি।
বিশু হাসল। অনেকক্ষণ ধরে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।
তারপর বলল।
নাং মানে ভালবাসার লোক তো। কজনের সঙ্গে পিরীত করেছ?
সেই মুহূর্তে কমলের ইচ্ছা হল লাফিয়ে গরুর গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।
বেলফুলের মালাটা ছিঁড়ে খন্ড খন্ড করে।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা করা যায় না। সেটা কমল জানে।

অবস্থা থাকলে, সামর্থ্য থাকলে, বাপ দুটো ছাগলকে এক হাঁড়িকাঠে কখনই বলি দিতো না। কমল নিরুপায়।

কোন উত্তর না দিয়ে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

গরুর গাড়ি থেকে বাস। তারপর ট্রেন।

জঙ্গীপুর পৌছল পরের দিন ভোরবেলা।

কমল শুনেছিল বলা হয়েছিল তাকে যে, বিশ্বনাথরা জঙ্গীপুররে সম্ভ্রান্ত পরিবার। অঢেল জমিজমা খেত খামার।

জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। আদি রং কি ছিল বোঝার উপায় নেই। ইটের পাঁজর ভেদ করে বট অশ্বত্থের চারা নির্বিবাদে বেড়ে চলেছে। ঘোড়ার গাড়ি থামতে শাঁখ, উলুধ্বনি কিছুই শোনা গেল না। কেউ বেরিয়েও এল না।

বরকর্তা হয়েছিল বিশুর দূর সম্পর্কের এক কাকা। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই কাকা সরে পড়েছে। এখানে সে থাকে না।

কোঁচা সামলে বিশু নামল।

উঠানে দাঁড়াল, বাজখাঁই গলায় চেঁচাল। মাতু, মাতু, আছিস?

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর এক শ্যামা যুবতী বের হয়ে এল। অসম্বৃত.পোশাক। বুকে আঁচলের বালাই নেই।

পরনে থান, কিন্তু পানের রসে দুটি ঠোঁট রাঙা। চোখের তারা চঞ্চল।

কি ব্যাপার গো? ডাকাত পড়েছে নাকি?

গাড়ি থেকে কনে তোল।

কনে?

মাতু অর্থাৎ মাতঙ্গিনী দুটি চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করল। ভ্রুদুটি কুঁচকে বিশুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলল।

আবার বিয়ে করে এনেছ নাকি?

কেন, আমার কি বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে?

বালাই, ষাট, বলতে আছে অমন কথা। এদেশে পুরুষদের বিয়ের বয়স যায় কখনও। চল, কনেকে নামিয়ে আনি।

বিশু আর এগোল না। উঠানে দাঁড়িয়ে কোঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলল।

আমি আছি এখানে। তুই যা।

মাতু এসে গাড়ির সামনে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে একবার দেখেই বলল।

ওমা, এ যে একেবারে কচি বৌ গো। তবে দিব্যি ফুটফুটে। কোথা থেকে জোটালে?

বিশু গর্জন করে উঠল।

আঃ, বৌটাকে রোদ্দুরে বসিয়ে রেখে কি দেয়ালা করছিস্। ঘরে তোল আগে।

এই প্রথম স্বামীকে কমলের ভাল লাগল।

লোকটা দেখতে যেমনই হোক, কথাগুলো কর্কশ, কিন্তু হৃদয় আছে।

মাতু কমলকে সাবধানে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল।

বিশু পিছন পিছন এল।

ঘর মাত্র দুখানা। একটা ঘর একটু বড়।

পুরনো একটা খাট। কাঠের আলমারী। গোটা দুয়েক টুল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কমলের দুটো চোখ ছল ছল করে উঠল।

তার দিদি চাঁপার সংসার। এই খাটেই হয়তো সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

বিয়ের পর দু বোনে আর সাক্ষাৎ হয় নি। চাঁপা আর কমল দু'জনের কেউই লেখাপড়া জানে না। কাজেই চিঠি লেখা সম্ভব হয় নি।

আজ সেই ঘরে কমল ঢুকছে।

শুধু দিদির ঘর নয়, দিদির মানুষটাও তার আপনজন।

মাতু ঘরের মধ্যে ঢুকল না। চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে চলে গেল।

বিশু এসে খাটের ওপর বসল।
পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে বলল।
আলমারির ওপর থেকে হাতপাখাটা দাও তো। উঃ, কি পচা গরমই পড়েছে!
তালপাখাটা পেড়ে কমল বাতাস করতে যেতেই বিশু বাধা দিল।
থাক, থাক। তুমি জামাকাপড় বদলে নাও। হাওয়া আমি নিজেই করতে পারব।
কমল শুনল না। পাখার বাতাস করতে লাগল।
বিশুর ওপর এখন সে খুব সদয়। রাস্তায় বা নিজের বাড়িতে তার যে পরিচয় পেয়েছিল, এখন যেন লোকটাকে সে রকম মনে হচ্ছে না।
বৌয়ের জন্য প্রাণে একটু দরদ আছে। মাতু ডুকল তোরঙ্গ নিয়ে।
কমল হাতপাখা রাখার অবকাশ পেল না। মাতু ঠোঁট মুচকে হাসল।
ওঃ, বৌ তোমার খুব কাজের গো দাদাবাবু। বিয়ের কনে সেবা করতে আরম্ভ করেছে।
এ কথার পর কমল আর বাতাস করতে পারল না। হাতপাখাটা ফেলে দিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দাঁড়াল।
বিশু বলল।
নাও, জামা কাপড় বদলে নাও। মাতু ডাবের জল থাকে তো দে দু-গ্লাস।
মাতু চলে যাবার পরও কমল পোশাক বদলাতে পারল না।
একটা পুরুষমানুষ এভাবে বসে থাকলে তার সামনে কমল কাপড় ছাড়বেই বা কি করে।
লোকটার কিন্তু এ সব দিকে খেয়াল নেই।
কমলের রেখে দেওয়া তালপাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস খাচ্ছে।
শেষকালে মুখ ফুটে কমল বলেই ফেলল।
এখানে কাপড় ছাড়বার জায়গা নেই।
চোখ না খুলেই বিশু উত্তর দিল।
বাথরুম? ওই কোণের দিকে টিনের ঘর আছে একটা।
তোরঙ্গ খুলে জামাশাড়ি বের করে কমল বেরিয়ে গেল।
শতচ্ছিন্ন টিন। নামেই আব্রু। টিনের পিপেতে জল টলটল করছে।
জল দেখে কমল নিজেকে আর সামলাতে পারল না। গা ধুয়ে নিল।
গা ধোয়া শেষ করে শাড়ি ব্লাউজ বদলে কমল বাইরে বেরিয়ে দেখল ঘর খালি।
বিশু নেই।
ভিজে শাড়ি ব্লাউজ হাতে নিয়ে কমল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই মাতু ঘরে ঢুকল।
ওমা বৌদি, ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাও আমার হাতে দাও। উঠানে মেলে আসি।
কমলের হাত থেকে মাতু ভিজে জামাশাড়ি নিয়ে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল।
দাদাবাবু একটু বেরিয়েছে। দাঁড়াও, তোমাকে ডাবের জল এনে দিই।
বিশু ফিরল সন্ধ্যার ঝোঁকে। পিছনে একটা লোকের মাথায় ঝাঁকা।
মাতু রান্নাঘরে ছিল। কমল আসন পেতে দাওয়ায়।
মাতু কোথায়?
রান্নাঘরে।
একবার ডাক তো।
বলেই বিশু বলল।
আচ্ছা থাক, আমিই ডাকছি।
দু-একবার ডাকতেই মাতু ছুটে এল।
কি বল?
এই ঘি ময়দাগুলো তুলে রাখ। কাল লাগবে।
লোকদের বলে এসেছ?
মাতুর প্রশ্নের উত্তরে বিশু বলল।

লোক বলাবলি আর কি। পাঁচজন ব্যমুনকে বলে এসেছি।
খাওয়া দাওয়ার পর মাতু কমলকে বিছানায় নিয়ে গেল।
পান খাও তো বৌদি?
কমল ঘাড় নাড়ল।
না।
তাহলে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়। সারাটা দিন বাসে ট্রেনে কেটেছে।
সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে কমল বলল।
উনি কি বাইরে? শুতে আসবেন না?
কমলের কথা শুনে মাতু গালে আঙুল ঠেকিয়ে বিস্ময়ে বলল।
ওমা, আজ যে কালরাত্রি। আজ কখনও একসঙ্গে শুতে আছে!
কালরাত্রি! কমল মনে মনে হিসাব করল।
পরশু বিয়ে হয়েছে। তারপর ট্রেনে একরাত কেটেছে। আজ তো ফুলশয্যা হবার দিন।
কি জানি দেশাচারে প্রভেদ থাকে।
এর উত্তর পরের দিন বিশুই দিল।
কালরাত্রি বিয়ের পরের রাতেই হবার কথা, কিন্তু সে রাত তো ট্রেনেই কেটেছে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা নয়, ট্রেনে তো পাশাপাশি বসেই এসেছি। তাই আজ ফুলশয্যা বুঝলে।
কমল কিছু বলল না। বিশুই বলল।
পাড়ার মেয়েরা তোমাকে সাজাতে আসবে বিকাল বেলা।
বিশু বেরিয়ে গেল। কমল চুপচাপ বসে রইল।
চাঁপাও হয়তো সেজেগুজে এখানে বসেছিল। আর এক ফুলশয্যার রাতে।
আর আজ চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তার দেখা পাওয়া যাবে না।
দুজন এসে দাঁড়াল। একটি মেয়ে, একটি বৌ।
তাদের নিজেদের যা সাজবার বহর, তাতে অন্যকে কি সাজাবে, ঈশ্বর জানেন।
ওমা, এ যে ছোট্ট বৌদি।
বৌটি বলল।
মেয়েটি শুধু হাসল।
তোরঙ্গের চাবি কমল তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল।
তোরঙ্গ খুলেই তারা অবাক।
একি, কখানা কাপড় বৌদি। ভাল শাড়ি তো নেইই।
কি করে ওদের বোঝাবে কমল, এই কখানা শাড়ি দিতেই ভৈরব মাস্টারের শরীরের অনেক ফোঁটা রক্ত ঝরেছে।
একটা সস্তা অথচ রঙদার শাড়ি বের করা হল। তার কাছাকাছি একটা ব্লাউজ।
সাজতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় নিল।
ওই তক্তপোষের এক কোণে কমল বসল।
বিশু একটা হ্যাজাক বাতির ব্যবস্থা করেছিল।
বাতিটা পুরোপুরি ঘরের মধ্যে টাঙানো নয়। কিছুটা আলো ঘরের মধ্যে কিছুটা বাইরের দাওয়ায়।
দু-একজন লোক এসেছে। তারা বিশুর সঙ্গে উঠানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। বৌ দেখতে ভিতরে আসেনি।
সেই মেয়েটি আর বৌটি কমলের কাছে বসেছিল। কথা বলছিল। কমলের বাপের বাড়ির কথা।
হঠাৎ মেয়েটি বলল।
সরলাদি আমি একটু বাইরে যাব। তুমি দাঁড়াবে এস।
বৌটি হাসল।
ভয় কিসের লা? একলা যা না।

না সরলাদি, ওই গোয়ালঘরের পাশে দিয়ে যেতে গা ছম ছম করে তুমি এস।
ঢং।
বৌটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল।
কমল জিজ্ঞাসা করল।
মেয়েটি গেল কোথায়?
বাড়িতে গেল, ছোট ভাই-বোনদের আনতে।
কিছুক্ষণ পরে কমল জিজ্ঞাসা করল।
ভয়ের কথা কি বলছিল?
ওই যে গোয়ালঘরের আড়কাঠে গলায় দড়ি দিয়েছিল, সেই থেকে অনেকে বলে সন্ধ্যার ঝোঁকে না কি দেখা যায়। আমি কিন্তু ভাই কোনদিন দেখি নি।
কে গলায় দড়ি দিয়েছিল?
কমলের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।
বৌটি চেপে গেল।
যাক ভাই। আজকের শুভদিনে ও সব আলোচনা করে দরকার নেই।
না, না বলুন, আমি ভয় পাব না।
তুমি শোন নি কিছু?
না তো।
বৌটি একটু ইতস্তত করল। বোধ হয় বলবে কি বলবে না, তাই ভাবল, তারপর বলেই ফেলল।
বিশুদার প্রথম বৌ।
দিদি?
কমল আর্তনাদ করে উঠল।
সম্পর্কে তোমার দিদিই তো হবে। সতীন দিদিই হয়।
না, না, সতীন নয়, আমার আপন দিদি। মায়ের পেটের বোন।
তুমি চাঁপা বৌদির আপন বোন? জানতাম না তো।
ততক্ষণে পাউডার আর চন্দন ভিজেয়ে চোখের জলের বন্যা নামল।
ছি, ছি, কেঁদনা। এমন দিনে কাঁদতে নেই। যারা দেখতে আসবে, তারা কি ভাববে।
কিন্তু আমি, আমরা তো শুনেছিলাম দিদি প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে।
একটি ভদ্রলোককে নিয়ে বিশু ঘরের মধ্যে ঢুকতে কমল থেমে গেলে। আঁচলের কোণ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল।
এই আমার অনুকুল জ্যাঠা। প্রণাম কর।
দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা। লোকটাকে কমল দেখতে পেল না। শুধু দেখল বৃহৎ আকারের পদ যুগল।
হেঁট হয়ে প্রণাম করে সোজা হয়ে বসতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠ কানে গেল।
বাঃ বেশ বৌ হয়েছে। সুখে থাক মা। পাকা চুলে সিঁদুর পর। এই নাও।
আন্দাজেই কমল দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করল। হাতের ওপর একটি শাড়ি এসে পড়ল। সাধারণ শাড়ি।
মাস ছয়েক অপূর্ব একটা শান্তির আমেজ।
বেলা আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে বিশু বেরিয়ে যেত, ফিরত সাতটা সাড়ে সাতটায়।
বাড়ির কাজ বলতে কিছুই নেই, সব কিছু মাতঙ্গিনীই করত।
কমল শুধু সাহায্য করত তাকে।
নিজে-কমল ক্ষীণাঙ্গী নয়, কিন্তু মাতু যেন যৌবনের ভারে টলমল।
কাঁখে কলসি নিয়ে মাতু যখন পুকুর থেকে ফিরত, দাওয়ায় বসে বসে ঈর্ষান্বিত চোখে কমল দেখত।
নিটোল স্বাস্থ্য, চলার নিখুঁত ছন্দ।
বিশুকে নয়, কমল মাতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

আচ্ছা আমার দিদি কি আত্মহত্যা করেছিল?
মাতু ঘর মুছছিল, কমলের প্রশ্নে চমকে উঠেছিল।
কে? কে বললো?
ফুলশয্যার রাতে যে বৌটি এসেছিল, তার কাছে শুনেছি।
মাতু সোজা হয়ে কমলকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর বলল,
কে সরলা? কি জানি। আমি ঠিক জানি না। সে সময় আমি দেশে গিয়েছিলাম। জমি ভাগ হচ্ছিল, সেই জন্য।
এ নিয়ে কমল আর কিছু বলে নি।
কি হবে সহজ সত্যটা জেনে। মানুষটা নেই, এটাই তো চরম সত্য।
কিন্তু কমল থাকতে পারে নি।
এক রাত্রে বিশুর আদর খেতে খেতে প্রশ্ন করল।
একটা কথা বলব?
বলে ফেল। বলে ফেল।
বিশুর বুখে মুখ ঘষতে ঘষতে কমল বলল।
দিদি কি করে মারা গিয়েছিল?
ঘর অন্ধকার, তাও কমলের মনে হল, দুটি তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি যেন তাকে জরিপ করছে।
হঠাৎ এ প্রশ্ন? কেউ কিছু বলেছে নাকি?
কিছুক্ষণ কমল কোন উত্তর দিল না।
কি, মাতু কিছু বলেছে?
না, না।
তবে?
সরলাদি বলছিল, দিনি নাকি আত্মহত্যা করেছে।
কোন উত্তর নেই।
কমল বুঝতে পারল বিশুর আলিঙ্গন শ্লথ হয়ে গেল।
কমলের ভয় হল। মানুষটা বুঝি খেপে উঠবে।
না, সে রকম কিছু হল না।
খুব মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল।
তোমাকে তা হলে সত্যি কথাটাই বলি। চাঁপা আত্মহত্যাই করেছে।
গলায় দড়ি দিয়ে।
হ্যাঁ। গোয়াল ঘরে।
কমল আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বুঝতে পারল, যা বলবার, বিশুই বলবে।
ঠিক তাই।
দু-বছর বিয়ে হল অথচ ছেলেপুলে হল না, তাই নিয়ে আমি একদিন রাগারাগি করেছিলাম। এ ব্যাপার করবে, তা কি ভাবতে পেরেছিলাম।
কিন্তু তুমি যে বাবাকে–
কমলের কথয় বাধা দিয়ে বিশু বলল।
এ ছাড়া আর কি বলব। আসল কথাটা শুনলে তোমার বাবা আঘাত পেতেন। ছেলে হবার ব্যাপার নিয়েই তো চাঁপা চলে গেল তাই ও কথা বলেছিলাম। যাতে ওর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পায়।
এসব দার্শনিক তত্ত্ব কমল বুজতে পারল না। দিদির জন্য নতুন করে তার শোক উথলে উঠল। ইচ্ছা হল, রাতের অন্ধকারে চীৎকার করে কাঁদে।
না, ঘুম পাচ্ছে।
কমলকে ছেড়ে বিশু শুয়ে পড়ল।
একটু পরেই নাসিকা গর্জন শোনা গেল।
হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে কমল চুপচাপ বসে রইল।
ছেলেপুলে হয় নি বলে দিদি এভাবে নিজের জীবন শেষ করে দিল?

কি দরকার ছেলেপুলের?

কতদিন তো বাপকে আক্ষেপ করতে শুনেছে, মেয়েদুটো যদি না থাকত তা হলে আমার আর এত চিন্তা থাকত না। ছেলেরা তো থেকেও নেই।

পরের দিন অন্ধকার নামতেই কমল গোয়ালঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গরু নেই। খালি গোয়াল। হয়তো কোনদিন ছিল। এখন কাঠকুটো বোঝাই থাকে।

আড়কাঠের দিকে চোখ ফেরাল। আধ-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না।

পরনের শাড়ি বেঁধে দিদি ওইখানে ঝুলে পড়েছিল।

বীভৎস ব্যাপার। এ রকম ঘটনা একবার কমল দেখেছে।

অনেকদিন পর্যন্ত চোখ বুজলেই দ্রশ্যটা বেসে উঠত। মজুমদার বাড়িরর বৌ।

কমলদের পিছনে পুকুর ধারের লালবাড়ি। সেটাই মজুমদারদের।

প্রথমে দেখতে পেয়েছিল একটা রাখাল।

গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল মজুমদারদের বাগানের মধ্যে দিয়ে, চোখে পড়তেই তীরবেগে ছুটতে ছুটতে ভৈরব মাষ্টারের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিল।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস। খুন।

ভৈরব মাষ্টার দাওয়াতেই বসেছিল। রাখালের সঙ্গে ছুটল। পিছন পিছন পিসি আর কমল।

আম গাছের একটা নীচু ডালে বৌটা ঝুলছে। ছি, ছি, গায়ে এক রত্তি সুতোও নেই।

থাকবে কোথা থেকে? পরনের শাড়িটাই তো পাকিয়ে গলায় দিয়েছে।

জিভটা ঝুলে পড়েছে, দুটো চোখ বিস্ফারিত, খোলা চুলের রাশ পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। কমলের মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। সে পিসিকে আঁকড়ে ধরেছিল সজোরে।

পিসি আর দাঁড়ায় নি। কমলকে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

পরে অবশ্য শুনেছিল শূলবেদনায় অতিষ্ঠ হয়ে বৌটা ওভাবে মরেছিল।

দিদিরও ওই রকম বিকৃত চেহারা হয়ে গিয়েছিল?

ছটা মাস খুব ভালই কেটেছিল। মাঝে মাঝে দিদির কথা মনে পড়ত বটে। এ ছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না।

আকাশের কোণে কোথায় একটুকরো কালো মেঘ জমেছিল কমল লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ একসময়ে সেই ছোট্ট মেঘ বড় হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল।

চারদিক অন্ধকার করে ঝড় উঠল। কমলের পায়ের তলার মাটিটুকু পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অসহ্য গরম পড়েছে। একটি গাছের পতা পর্যন্ত নড়ছে না।

শাড়িটা অবধি ঘামে ভিজে উঠেছে!

হাতড়ে হাতড়ে কমল দেখল, বিছানা খালি, বিশু নেই।

বোধ হয় গরমের জন্য মাদুর নিয়ে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে শুয়েছে।

বালিশ নিয়ে কমলও উঠে দাঁড়াল।

ফিকে জ্যোৎস্না । দেখার কোন অসুবিধা নেই।

দাওয়ার ওপর মাদুর পাতা। সেই মাদুরে বিশু আর মাতু আলিঙ্গনাবদ্ধ।

খুব আস্তে পা টিপে টিপে কমল ফিরে এল।

নিজের বিছানায় বসে আকাশ পাতাল চিন্তা।

বিশুই বলেছিল মাতু তার খুব দূর সম্পর্কের বোন। তার কপাল পুড়তে বিশু নিজের সংসারে তাকে নিয়ে এসেছিল।

মাতুর চালচলন, বিশেষ করে তার উদ্ধত যৌবন, কমলের ভাল লাগে নি, কিন্তু বিশুর সঙ্গেএমন একটা সম্পর্কের কল্পনাও সে করতে পারে নি।

এমন কি হতে পারে, চাঁপা এমন একটা দৃশ্য দেখেই গলায় দড়ি দিয়েছিল?

এর চেয়ে মারাত্মক দৃশ্য স্ত্রীর পক্ষে আর কি হতে পারে।

কালরাত্রি প্রভাত হল।

কমল ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই বিশু এসে তার পাশে যখন শুয়েছে কিছুই জানতে পারে নি। রোদ মুখে পড়তেই কমল উঠে পড়ল।

বিশু নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। ধুতিটা হাঁটুর অনেক ওপরে। দুটো হাত বুকের ওপর জড় করা। অন্যদিন হলে, কমল ধুতিটা নামিয়ে দিত। বিশুকে ডাকত। এখন না উঠলে তার অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

আজ আর সে সব কিছু করল না।

পাশে শোয়া মানুষটাকে সম্পর্কহীন অন্য একটা লোক বলে মনে হল।

মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক।

কমল স্নান সেরে নিল।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, মাতু ভিজে কাপড়ে রান্না চড়িয়েছে।

কাপড়টা এত ভিজে যে মেয়ে হয়েও মাতুর দেহের দিকে চোখ ফেরাতে পারল না। মাতুর ভ্রুক্ষেপও নেই।

এই ভাবেই পুকুর থেকে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে।

নষ্ট মেয়েমানুষ।

দাঁতে দাঁত চেপে কমল ফিস ফিস করে বলল।

আজ খুব ভোরে উঠেছ তো?

ভোরে তো রোজই উঠি।

এত ভোরে? দাদাবাবু ওঠে নি?

এই প্রথম কমলের মনে হল, দাদাকে দাদাবাবু বলাটা অর্থহীন।

মাতুর কথায় কমল কোন উত্তর দিল না।

পাশের উনানে কাগজ জ্বেলে কমল চা করতে বসল।

রান্নাঘর থেকেই বুঝতে পারল, বিশু উঠেছে।

দাওয়ায় বসে সশব্দে দাঁতন করছে।

অন্যদিন কমলই চা দেয়, আজ আর ইচ্ছা করল না।

চা তৈরি করে কমল বলল।

চাটা তোমার দাদাবাবুকে দিয়ে এস তো।

কেন, তোমার কি হল?

নিরুপায় হয়ে কমল বলল।

আমার শরীরটা ভাল নেই।

কথাটা মাতুর কানে যাওয়া মাত্র সে দুটি চোখের অশ্লীল ভঙ্গি করে বলল, ওমা, এর মধ্যে। তা, দাদাবাবুকে বলেছ কথাটা?

কমলের বয়স বেশি নয়, কিন্তু এসব কথা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না।

সে ভ্রুভঙ্গি করে বলল।

কি বলছ যা তা? কাল গরমে সারাটা রাত একটু ঘুমাতে পারি নি। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

মাতু আর কথা পাড়ল না। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কমল রান্নাঘরে বসেই নিজের চাটা খেয়ে নিল।

অন্যদিন অফিসে যাবার সময় কমল বিশুর কাছাকাছি থাকে। পানের খিলি এগিয়ে দেয়। দু-একটা কথাও বলে।

আজ আর ওদিকে গেল না। কজের ছুতো করে বাগানে চলে গেল।

উনোন ধরাবার জন্য গাছের শুকনো ডালপালা জোগাড় করা, ঘুটে তোলা, নারকেলের পাতা কুড়ানো, এইসব করে সকালটা কাটিয়ে দিল।

এক সময় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, বিশু অফিসের পথে রওনা হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এল।

রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে বসে মাতু তেল মাখছিল। গা মাথার কাপড় খুলে। নির্লজ্জ মেয়েছেলে। এখানে অবশ্য বাইরের কোন পুরুষ মানুষ আসবার কথা নয়। কিন্তু লজ্জা কি

কেবল পুরুষ মানুষকেই।

এও হতে পারে, নিজের নিটোল যৌবন মাতু কমলকে দেখাতে চায়। এক ঘরে যখন বাস। আজ নয় কাল, নিজের স্বামীর সঙ্গে মাতুর অবৈধ সম্পর্কের কথা কমল জানতেই পারবে। এই আকর্ষণের হেতুটাও জানুক।

কমলের বয়স কম। তার যৌবন এখনও ততটা পুরন্ত নয়, কিন্তু মাতুর শরীরের খাঁজে খাঁজে পুরুষদের বিবশ করার মন্ত্রগুপ্তি।

মাতুকে পাশ কাটিয়ে কমল নিজের ঘরে ঢুকল।

এ বাড়িতে এতদিন মাতু পরম নির্ভর ছিল। বিপদে তার কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ত, এখন কিন্তু মাতু কমলের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

রাত্রে কমল পরিত্রাণ পেল না।

বিশু তাকে নিষ্পেষিত করে শরীরের স্বাদ নিয়ে তবে ছাড়ল।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কমল ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

বোধ হয় মাঝ রাত। তখনও কমল ঘুমায় নি। দরজায় খুক খুক শব্দ।

বোঝা গেল বিশুও ঘুমায় নি। চুপচাপ উঠে বসল।

কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল।

বোধ হয় পরখ করল, কমল সত্যিই ঘুমিয়েছে কি না।

নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল। এবার আর দাওয়ার দিকে নয়। ভিতরের ঘরে। রান্নাঘরের সামনের খালি জায়গাটায়, যেখানে মাতু শোয়।

সে এক দৃশ্য। দেখতে দেখতে কমলের সারা শরীর জ্বালা করে উঠল।

আচমকা চাবিশুদ্ধ আঁচলচটা ঝনাৎ করে দরজার কড়ার উপর পড়তেই বিশু আর মাতু দুজনেই উঠে বসল।

তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে কমল নিজের বিছানায় ফিরে এল।

অন্যদিন চাবিটা বালিশের তলায় রেখে দেয়, আজ মনের অবস্থার জন্য খেয়াল হয় নি। তাই শব্দ হয়ে গেছে।

বিশু বিছানায় এল না। দরজার কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল।

কমল ঘুমে অচেতন। বিশু আবার মাতুর কাছে ফিরে গেল।

মাতু কিছু জিজ্ঞাসা করে থাকবে, তার উত্তরে বিশু বলল, না, ঘরে নয়। অন্য কোথাও আওয়াজ হয়েছে।

পরের দিন ভোরে উঠে কমল দেখল বিশু আগেই উঠে গেছে।

তার মনে পড়ে গেল আজ রবিবার। ছুটির দিন সকালে উঠে বিশু পাড়ায় টহল দিতে যায়। বাড়িতে চাও খায় না। কমল যেন নিশ্চিন্ত হল।

এখন অনেকক্ষণ লোকটার মুখোমুখি হতে হবেনা। ছলনার অভিনয় করার প্রয়োজন হবে না।

মুখ হাত ধুয়ে কমল রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েই চমকে উঠল।

তখনও মাতু শুয়ে রয়েছে।

এত বেশী শোয়া। বাড়িতে যে অন্যলোক আছে, মাতু যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

মাতুদি, মাতুদি।

বার কয়েক ডাকার পর মাতু চোখ খুলল।

হাত দিয়ে বুকের ওপর কাপড় টেনে দিয়ে বলল, আমার জ্বর হয়েছে বৌদি, আমি আর একটু শুয়ে নিই।

আগের দিন হলে কমল তার গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপের মাত্রা পরীক্ষা করত, আজ আর পারল না।

ওই দেহের সঙ্গে একটা পুরুষের স্পর্শ ছড়ানো, সে পুরুষ ব্যভিচারী। কমল আর কথা না বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘড়াটা কাঁখে তুলে নিল।

খাবার জল আর রান্নার জল আগে আনতে হবে।

এর আগে বার কয়েক কমল মাতুর সঙ্গে গেছে। নিতান্ত শখ করে। ঘড়া বয়ে আনে

নি। মাতু আনতে দেয় নি। যেতে যেতে কমল ভাবল।
শরীর খারাপ না ছাই। সারা রাত হুল্লোড় চলেছে, তাই সকাল বেলা ওঠার অবস্থা নেই।
কমলের ইচ্ছা হল এ সংসারে আগুন জ্বালিয়ে কোথাও চলে যায়। যেখানে স্বামী নিজের নয়, সে সংসার আঁকড়ে থাকার কোন মানে হয় না।
এ সংসার করা নয় , সংসার সংসার খেলা!
ফেরার পথেই কমল মুশকিলে পড়ল। পুকুরে একেবারে ডুব দিয়ে নিয়েছে।
ভিজে কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। দেহে কিছু না থাকারই সামিল। আর লোকটাও তো আচ্ছা পথ আটকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।
এ পাড়ার বিশেষ কাউকেই কমল চেনে না।
ফুলশয্যার দিন জন কয়েকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের কাউকে মনেও নেই।
ফর্সা চেহারা। মাথায় চুলের চুড়ো। বাহারে শার্ট আর চওড়া ফিতা পাড় ধুতি।
চোখাচোখি হতেই কমল স্পষ্ট দেখল লোকটা মুচকি হাসছে।
এ হাসির ধরন সব মেয়ের চেনা।
কমল একটু ইতস্তত করল। সরু পায়ে চলা পথ। পাশ কাটিয়ে যাবে, সে উপায় নেই।
চকিতের জন্য একটা কথা কমলের মনে পড়ল।
সংসারে সুখ নেই বলে চাঁপা মরেছিল, কিন্তু কমল বাঁচবে।
নিজেকে মুছে ফেলবার কোন চেষ্টা সে করবে না।
হাসি ফেরত দিয়ে কমল কুণ্ঠাজড়ানো গলায় বলল।
পথ ছাড়ুন। যাব।
লোকটা পথ তো ছাড়লই না, বরং আর একটু এগিয়ে বলল।
বাঃ, বাঃ, এ জঙ্গলে এমন গোলাপ ফোটে? কি রূপ গো তোমার মেয়ে!
চমৎকার ভরাট কণ্ঠস্বর। বিশুর মতন কর্কশ নয়।
কথা বলার সময় চোখ দুটোরও কি অপূর্ব ভঙ্গি।
আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।
লোকটার হাসি অম্লান।
বলছিলাম কি, এমন অজপাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দরী মেয়ে এল কোথা থেকে?
আমার স্বামীর নাম, কমল একটু মাথা নীচু করে ভাবল, স্বামীর নামটা বলা সমীচীন হবে কি না, তারপর বলে ফেলল।
স্বামীর নাম, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।
লোকটা হেসে উঠল।
সে কি, একেবারে গোবরে পদ্মফুল। একটা বৌ তো ওর যন্ত্রণায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। নিজেই মেরে তাকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে কিনা, ঈশ্বর জানেন।
তুমি বুঝি দ্বিতীয় পক্ষ?
রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে কমলের সাহস হল না।
কে কোথায় দিয়ে দেখে ফেলবে। তারপর রঙ ফলিয়ে বলে বেড়াবে।
লোকলজ্জা, সমাজ ভয় দুটোই কমল বিসর্জন দিতে চায়।
যার স্বামী একনিষ্ঠ নয়, তার আবার সামাজিকতা।
সরুন, বাড়ি যাব।
লোকটা একটু সরল। মুখ টিপে হেসে বলল।
আজ ছুটির দিন, অসুবিধা আছে। কাল আসব?
স্পর্ধা তো কম নয়। কমলকে এত সস্তা ভাবল কি করে!
কোন উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে কমল পার হয়ে এল।
বাড়িতে এসেও বুকের ধুকধুকি কমলো না।
মাতু ততক্ষণে উঠে বসল। কমলকে দেখে বলল।
হ্যাঁ বৌদি, এত দেরী হল জল আনতে?
গম্ভীর কণ্ঠে কমল বলল।

স্নান সেরে এলাম।
সারাটা দিন বিশুর সঙ্গে বিশেষ কথা হল না।
কমল এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশু শুয়ে পড়ল।
কমল জানে, এ নিদ্রা বেশিক্ষণের জন্য নয়।
একটু পরেই উঠে বোসেদের দাবার আসরে যাবে।
মাতু কিছু খেল না। চুপচাপ শুয়ে রইল।
কমল খাওয়ার কথা একবার বলেছিল।
মাতু উত্তর দিয়েছে;
না বৌদি, কিছু খাব না। উপোস দিলেই সেরে যাবে।
কমল আর সাধে নি। মনে মনে মাতুর মৃত্যুকামনা করেছে। মাতু মরুক, মরুক।
মাতু তার জীবনের শনি। সে তার জীবন থেকে সরে গেলে আবার বিশুকে সে নিজের করে নেবে।
সে রাতে ভরসা করে কমল জিজ্ঞাসা করে ফেলল।
বিশু যখন তাকে টানাহেঁচড়া করছে, তখন তাকে সজোরে ঠেলে দিয়ে বলল।
তুমি ছোঁবে না আমাকে।
কেন, আমার অপরাধটা কি?
রাতের বেলা উঠে কোথায় যাও?
ঘর অন্ধকার। এক ফোঁটা আলো কোথাও নেই।
তবু সেই অন্ধকার ঘরে কমল বুঝতে পারল বিশু দাঁত দিয়ে সশব্দে ঠোঁট চাপল। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে।
কোন উত্তর নেই। মনে মনে লোকটা বোধ হয় উত্তর সাজাচ্ছে।
বেশ একটু পরে বিশু আবার বলল।
কোথায় আবার যাই?
কোথায় যাও তুমিই বল না?
মাঝে মাঝে উঠতে হয় না মানুষের?
সত্যি কথা বল।
কণ্ঠের দৃঢ়তায় কমল নিজেই বিস্মিত হল।
সত্যি কথা আবার কি?
আমি জানি তুমি কোথায় যাও। কার কাছে।
এবার বিশু খেপে উঠল।
বোধহয় আন্দাজ করতে পারল, কমল সব জানতে পেরেছে।
কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করে বল?
গলার স্বর তো এমনিতেই কর্কশ। আরো যেন কুৎসিত শোনাল।
কিন্তু কমল ভয় পেল না।
তার জীবন বাজী। চুপ করে থাকলে সে সব হারাবে; তার চেয়ে এ ব্যাপারের একটা ফয়সালা হয়ে যাক।
কমলের কথা শেষ হবার আগেই প্রচন্ড জোরে তার গালে একটা চড় এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারাটা গাল ফুলে উঠল।
এই শেষ নয়। চুলের মুঠি ধরে পিঠে পদাঘাত।
কমল খাট থেকে ছিটকে মাটির ওপর পড়ে গেল।
হারামজাদীর ছোট মুখে বড় কথা। মাষ্টারের মেয়ে আর কত হবে।
আমাকে শাসন করতে আসা, এত স্পর্ধা।
কমল ভেবেছিল আরো প্রহার চালাবে। মুখোশ যখন খুলে গেছে তখন বিশু অল্পে ছাড়বে না।
কিন্তু দরজার গোড়ায় মাতু এসে দাঁড়াল।
কি হল কি, ও দাদাবাবু।

দেখ না, খানকির কথাবার্তার ছিরি। আমি যেন ওর বাপের একচালায় থাকি, তাই শান করতে এসেছে।

তোমাকে বললাম না কাল রাতে চাবির শব্দ পেলাম।

মাতু ভয় পেয়েছে, কণ্ঠ শুনে এমন মনে হল না।

তবে আর কি, ভয়ে আমি একেবারে সিটিয়ে গেছি। একটু বেচাল দেখলে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।

মাতু এবার এগিয়ে এল। বিশুর কাছাকাছি।

তুমি শুয়ে পড়তো দাদাবাবু। চেঁচামেচি করে শরীর খারাপ কর না। নাও শোও। মাতু বোধ হয় মাথার বালিশটা ঠিক করে দিল।

মাতু চলে যেতে আস্তে আস্তে কমল উঠে বসল।

খাট থেকে বিশুর নাসিকাগর্জন ভেসে আসছে।

নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে মানুষটা।

এখনও ভোর হতে অনেক দেরী। চারদিকে গভীর অন্ধকার।

কমল উঠানে এসে দাঁড়াল। কিন্তু যাবে কোথায়।

একলা বাপের বাড়ি যেতে পারবে না।

পথ চেনে না। তাছাড়া ভৈরব মাষ্টারের সংসারে বাড়তি বোঝা হবার সাধ তার নেই।

ভৈরব মাষ্টার কোন কথা শুনবে না। বিশুর বাড়ি ফেরত পাঠাবে।

কমল দাওয়ার ওপর শুল।

আঁচলটা মুখে ঢাকা দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল।

ঘুম এল না। আসা সম্ভব নয়।

প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক কানে এল। ঝিঁঝিঁর শব্দ।

ভৈরব মাষ্টার বড়মানুষ নয়। দুঃখের আগুনে পুড়ে, কষেষ্টর ভাত খেয়ে কমল মানুষ। কিন্তু কোনদিন তার গায়ে কেউ হাত তোলে নি।

গালের ওপর কমল একবার হাত বোলাল। পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠেছে। এক সময়ে ভোর হল।

কমল উঠে মুখহাত ধুয়ে চুপচাপ গোয়ালঘরে গিয়ে বসে রইল।

সেখান থেকেই বুঝতে পারল বিশু বোধহয় খোঁজাখুঁজি করছে।

বিশুর গলা শোনা গেল।

মাতু, আবাগীর বেটি গেল কোথায়?

কি জানি, কোথাও বোধ হয় গোসা করে বসে আছে।

আমি অফিসে বেরিয়ে যাবার পর তোকে যদি কিছু বলে, ঝাঁটার বাড়ি মারবি।

তোকে আমি বলে গেলাম।

মাতু কোন উত্তর দিল না। বিশু খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেল।

বোধ হয় তার ধারণা কমল বাগানে কোথাও বসে আছে। সে যে বাড়ির এত কাছে গোয়াল ঘরে থাকতে পারে, সেটা বিশু ভাবতেই পারে নি।

কিন্তু বিশু বেরিয়ে যাবার পর মাতু ঠিক খোঁজ পেয়ে যাবে। পিছনের উঠানে ঝাঁট দেবার সময় এদিক ওদিক দেখে কমল গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পায়ে চলা পথ ধরে খিড়কির পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল।

এর পর পুকুরে ভিড় হবে।

বাড়ির কর্তারা বেরিয়ে গেলেই মেয়েরা স্নান করতে আসবে।

দু ঘন্টা ধরে বেআব্রু হয়ে স্নান আর আদি রসাত্মক কথাবার্তা।

পুকুরের কাছাকাছি গিয়েই কমল থমকে দাঁড়াল।

একটা ঝাঁকড়া পাকুড় গাছতলায় লোকটা পায়চারী করছে।

বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কমলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটার মুখে হাসি ফুটল।

এক ঘন্টার ওপর অপেক্ষা করছি।

কমল চকিতের জন্য ঘাটের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ঘাট খালি।

কাল লোকটার প্রতি কমল এমন কিছু আকর্ষণ বোধ করে নি। আজ কিন্তু তাকে ভাল লাগল।

পরিষ্কার পোশাক, সযত্নে আঁচড়ানো চুল, হাতে ছোট একটা সুটকেস।

কেন অপেক্ষা করছেন কেন?

থেমে থেমে কমল প্রশ্ন করল।

উত্তর যেন লোকটার মুখে লেগেই ছিল।

তোমাকে উদ্ধার করব বলে।

উদ্ধার!

হ্যাঁ, নরক থেকে।

কথাটা কমলের মনে লাগল।

নরক, নরক, ছাড়া আর কি! স্বামী যেখানে বিয়ের মন্ত্রের মর্যাদা রাখে না, ব্যভিচার করে। বলতে গেলে স্ত্রীকে আঘাত করে সেই নরককুন্ডে কেউ থাকতে পারে!

আপনি থাকেন কোথায়?

নৈহাটির নাম শুনেছ? নৈহাটি, হালিশহর? সেখানকার অম্বিকা নাট্য সমাজের আমি হিরো!

হিরো!

কথাটা বোধ হয় কমল বুঝতে পারল না।

হিরো বুঝলে না? যে মেইন পার্ট করে আর কি, যেমন চাঁদসদাগরে চাঁদসওদাগর, কালকেতুতে কালকেতু, শ্রীদুর্গায় মহিষাসুর।

বাইরের চটকে কমলের বিশেষ মন ভুলল না। সে একটু ভালবাসার কাঙালিনী। এমন ঘরে সে যেতে চায়, যেখানে কেউ তাকে অনাদর করবে না। অন্তত বাড়ির মানুষ।

কিন্তু মুখ ফুটে কমল সে কথা কি করে বলবে।

যাবে আমার সঙ্গে? যাবে তো বল, এগারোটা কুড়ির গাড়ি।

গায়ের মধ্যে দিয়ে এভাবে যাব কি করে ?

রোদ লেগে গালের আঁচড় আবার জ্বালা করে উঠল। পশুর স্থূল হাতের দাগ।

এমন মানুরে সঙ্গে কে ঘর বাঁধবে।

কমলের কথায় লোকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আরে যদি যাও তো সে ব্যবস্থা করব। তুমি হেঁটে রথতলা চলে যাও। সেখান থেকে গরুর গাড়ি নিও। আমি ষ্টেশনে ভাড়া দিয়ে দেব।

আমি কিন্তু আর বাড়ি ফিরব না। এই ভাবেই যাব।

ঠিক আছে ঠিক আছে। বাড়ি ফিরলেই তো মাতু নজরবন্দি করে রাখবে।

রথতলা যেতে যেতে কমল বার কয়েক থামল।

বুকের মধ্যে অসম্ভব দাপাদাপি।

এত শুধু বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া নয়, সমাজ ছেড়ে, বিয়ের বাঁধন দু-পাশ ফেলে বেরিয়ে আসা। আর মানুষটার কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না।

রোদ লেগে গালের কালশিটের যন্ত্রণা বাড়ল। কমল মাথায় ঘোমটা দিয়ে রোদ থেকে বাঁচবার চেষ্টা করল।

ঘোমটা শুধু রোদের জন্য নয়, পড়শীদের নজর এড়াবার জন্যও।

ষ্টেশনে পৌছে দেখল লোকটি চায়ের দোকানে বসে আছে।

কমলকে দেখল বটে কিন্তু তার দিকে এগিয়ে এল না। গরুর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিল। কমল বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসল।

ঝাঁকড়া একটা গাছ বেঞ্চের পাশে, তাই ছায়া রয়েছে।

সারা প্ল্যাটফর্মে জন তিনেক লোক।

অফিসযাত্রীদের সময় পার হয়ে গেছে।

এদিক ওদিক দেখে লোকটা একসময়ে কমলের কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। এই নাও তোমার টিকিট। আর শোন, ট্রেনে আমি কথা না বললে তুমি কথা বলবে না।

বেঞ্চের ওপর হলুদ রঙের একটা টিকেট এসে পড়ল।

কমলের মন এখন অনেক দূরে।

দিন দুয়েক হয়তো খোঁজাখুঁজি হবে, তারপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভৈরব মাষ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়বে। মুখে চোস্ত বুলি।

পায়ের ধুলো দিন শ্বশুরমশাই। অদ্ভুত দুটি মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। একটি বিয়োতে গিয়ে টেঁসে গেল, আর একটি নাগরের সঙ্গে হাওয়া।

ভৈরব মাষ্টারের কি হাল হবে কমল এখন থেকেই বুঝতে পারছে।

ভদ্ররলোক হয়তো ভিরমিই যাবে।

কি করবে কমল?

এখনও সময় আছে। পা টিপে টিপে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে চুপি চুপি নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে।

এখানে থাকতে হলে মাতুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এছাড়া আর উপায় নেই।

মাঝরাতে স্বামী উঠে যাবে বিছানা ছেড়ে, তাও সহ্য করতে হবে।

এই কুৎসিত জীবনের সঙ্গে আপস করতে কমল রাজি নয়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গলায় মালা দিয়ে যে মেয়েটি এ সংসারে ঢুকেছিল, তার মৃত্যু হয়েছে।

দুরদিকচক্রবালে ধোঁয়ার কুন্ডলী।

যে কয়েকজন লোক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, তারা একটু এগিয়ে গেল।

কমলও উঠে দাঁড়াল। ইঞ্জিন দেখা গেল। ট্রেনের শব্দ। একটু পরেই ট্রেন এসে থামল। কমলের পাশে পাশেই লোকটা রইল। কামরা প্রায় খালি। গুটিদশেক লোক বসে আছে।

কমল জানালার ধারে বসল। টিকেটটা আগেই আঁচলে বেঁধে নিয়েছিল।

লোকটা উল্টোদিকে বসল। একটু দূরে।

নৈহাটির কাছাকাছি ট্রেন আসতে কমল বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। সারি সারি কলকারখানা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। রাস্তায় রীতিমত ভিড়।

কলকারখানার ছুটির সময়। সেই জন্যই রাস্তাঘাটে এত লোক।

নৈহাটি ষ্টেশন।

পাশাপাশি অনেকগুলো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

এত বড় ষ্টেশন কমল এর আগে আর দেখে নি।

ট্রেন থামতে লোকটা নামল।

পিছন পিছন কমল।

ষ্টেশনের বাইরে এসে লোকটা একটা রিক্সা নিল।

পাশাপাশি বসল দুজনে।

এতক্ষণ লোকটা এক কামরায় বসেও কথা বলবার সুযোগ পায় নি, তাই এতক্ষণে তার মুখে খৈ ফুটল।

আমার নাম তো তুমি জান না আ[illegible] শেখর রায়। [illegible], অপাত্রে পড়নি। তোমাদের গাঁয়ে আমার মামার বাড়ি। মামাতো দুই ভাই আছে। তাদের কাছে মাঝে মাঝে যাই। তোমার কথা আমি আগেও শুনেছি।

কার কাছে?

আমার মামাতো বৌদিদের কাছে। তোমার রূপের প্রশংসা।

অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু শহরে এত আলো যে কোথাও এক টুকরো আঁধার নেই।

তবু সেই আলোর মধ্যেই শেখর একটা হাত দিয়ে কমলের হাত চেপে ধরল।

আমার বড্ড ভয় করছে।

ফিস ফিস করে কমল বলল।

ভয়? কেন, কাকে ভয়?

লোকটা যদি খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়?

কে, বিশু? মাথা খারাপ তোমার। এক নম্বরের লম্পট। ওকে সবাই চেনে। গাঁয়ে কম কেলেঙ্কারি করেছে।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে কমল আবার বলল।

আমি এভাবে চলে এলাম, তুমি আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবলে না তো?

কি যে বল, শেখর হাতের চাপ আরো নিবিড় করল, তুমি আর এলে কোথায়? বলে বলে আমিই তো তোমাকে ঘর ছাড়ালাম। না যদি চলে আসতে তাহলে তোমার দিদির অবস্থা হত। মেরে আড়কাঠে গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত।

হঠাৎ শেখর চেঁচিয়ে উঠল।

এই রাখ, রাখ বাঁদিকের বাড়ি।

মাথা নীচু করে কমল দেখল, পাকা দু'তলা বাড়ি। সাদা রঙের।

একতলায় একখানা ঘর। বেশ ছোট।

বারান্দার অর্ধেকটা টিন দিয়ে ঢাকা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা। একটা দড়ির খাটিয়া, খুব ছোট একটা টেবিল, একটা টুল।

আলনার বালাই নেই, কোণের দিকে একটা দড়ির ওপর কয়েকটা কাপড় জামা।

এই হচ্ছে আমার দৌলতখানা।

শেখর হাসতে হাসতে বলল।

ক্লান্ত কমল খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল।

দৈহিক ক্লান্তির চেয়েও মানসিক শ্রান্তিই বেশি।

এত শুধু বাড়ি বদলই নয়, সংসার বদল।

সামনে দাঁড়ানো মানুটা কেমন হবে কে জানে?

এমন তো সম্ভব নয়, ভাল না লাগলে দুদিন পরে কমল আবার নিজের পুরানো সংসারে ফিরে যেতে পারবে।

যে চৌকাঠ পার হয়ে এসেছে, সেটা এখন এত উঁচু যে ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য কমলের নেই।

আপনার রান্নাবান্না কে করে?

এখনও আপনি? তার মানে মন থেকে এখনও তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পার নি?

লোকটা কথা ভাল বলে। বিশু এত সুন্দর কথা বলতে পারত না।

আঁচল দিয়ে কমল মুখটা মুছল। শুধু ঘাম নয়, লজ্জার ভাবটুকুও মোছবার চেষ্টা করল।

তারপর বলল।

তোমার রান্নাবান্না কে করে?

কে আবার করবে, আমি করি। অম্বিকা নাট্য সমাজের বায়না থাকলে বাইরে খাই, নইলে একবারে স্বপাক।

তোমাকে বাইরে যেতে হয় নাকি?

কমল ভয় পেল। তাহলে এই অজানা জায়গায় তাকে একলাটি থাকতে হবে?

কিছু বলা যায় না, গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিশু যদি এসে হাজির হয় ঘাড় ধরে তাকে নিজের ডেরায় নিয়ে যাবে।

স্বামী নিয়ে যাচ্ছে নিজের স্ত্রীকে। কাজেই কারও কিছু বলবার নেই।

কমল যদি বিশুকে অস্বীকার করে, তাহলেও নিস্তার নেই। সাক্ষীসাবুদের অভাব হবে না। কমলের আপত্তি করার কোন যুক্তি নেই।

তাই কমল জিজ্ঞাসা করল বাইরে যাবার কথাটা।

আরে ঘন ঘন কি আর যেতে হয়, তাহলে তো কুবের বনে যেতাম। সারাটা বর্ষা বাড়িতে বসে থাকতে হয়। গরমেও কিছুটা সময়। কেবল শীতকালেই যা বায়না।

আমাকে একলা থাকতে হবে?

দূর একলা কেন? ওপরে মাসিমা রয়েছে না।

মাসিমা।

আপন মাসিমা নয়। পাতানো। ওপরের ভাড়াটে। দাঁড়াও ডাকি একবার।
কোথায় বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে তার উদাত্ত কণ্ঠ ভেসে এল।
মাসিমা, ও মাসিমা।
বার কয়েক ডাকার পর নারীকণ্ঠে উত্তর এল।
কেরে, শেখর নাকি?
হ্যাঁ মাসিমা, বৌ দেখবে তো এস।
বৌ? বিয়ে করে এলি নাকি?
সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে সম্মিলিত পায়ের শব্দ। কমল লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। ছি, ছি, কি বেহায়া লোক। একেবারে বৌ বলে পরিচয় দিল।
আর কিছু ভাববার আগেই দরজার কাছে দুটি নারী মূর্তি এসে দাঁড়াল।
একটি প্রৌঢ়, ফর্সা, অন্যটি তরুণী কিন্তু নীতিমত স্থূলাঙ্গী।
কমল চুপচাপ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বাঃ, চমৎকার বৌ হয়েছে তো। প্রৌঢ়ার কণ্ঠ।
বৌ সুন্দরী হলে হবে কি মাসিমা, ভারি অপয়া।
ওমা, একি অলক্ষণে কথারে। অমন কথা বলতে আছে।
না বলে কি করি বল। সুটকেস সুদ্ধ নতুন কাপড় ট্রেন থেকে উধাও। বৌয়ের জিম্মায় ছিল।
তা বৌ কি করবে, তুমি বেটাছেলে তো সঙ্গে ছিলে শেখর ঠাকুরপো।
এই প্রথম স্থূলকায়া কথা বলল।
ভীষণ ভড় ট্রেনে, জানেন; কে যে কখন সুটকেসটা নিয়ে নেমে গেল, কে জানে।
তোমরা মুখ হাত ধুয়ে নাও। আজ আর রান্নাবান্নার দরকার নেই। আমার ওখানেই দুটি জোলভাত খাবে। এস বৌমা।
দুজনে ওপরে উঠে গেল।
কমলের একটি শাড়ি ভরসা। সেইজন্য যে শেখর সুটকেস চুরির প্রসঙ্গে মিথ্যা অবতারণা করল সেটা বুঝতে কমলের অসুবিধা হল না।
শেখরও খুব খুশি।
কমল, কালই তোমাকে অম্বিকা নাট্য সমাজে নিয়ে যাব।
আমাকে? কেন?
বিনা মহড়ায় অভিনয় যা করলে চমৎকার।
আমি আবার কি অভিনয় করলাম?
বাঃ, কাঁচুমাচু হয়ে বললে না, ট্রেনে ভীষণ ভিড়। কে যে সুটকেস নিয়ে গেল জানতে পারলাম না।
দু-জনেই সজোরে হেসে উঠল।
হাসি থামতে কমল বলল।
বড্ড গরম লাগছে।
তাহলে স্নানই করে ফেল। আমি দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি।
স্নানের ঘর কোথায়?
ওই যে বারান্দার ডানদিকে।
একটু এগিয়েই কমলের মনে পড়ে গেল। শাড়ি ভেজালে পরব কি?
সত্যিই তো, একটি মাত্র শাড়িই তো সম্বল।
তুমি শাড়ি ভিজিও না। এই গামছাটা জড়িয়ে স্নান সেরে নিও। আমি বরং আসার সময় দোকান থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে নিয়ে আসব। নাও দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দাও। আমি বের হচ্ছি।
শেখর বেরিয়ে যেতে কমল দরজায় খিল তুলে দিল।
স্নানের ঘরে ঢুকেই কমল অপ্রস্তুত।
নীচু টিন, কমলের গলা পর্যন্ত। তাও আস্ত নয়, সহস্র ফুটো।

এখানে চান করাই তো মুশকিল।

তবে একটা সুবিধা, এদিকে আগাছার জঙ্গল। লোকজন আসার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। কোণে একটা চৌবাচ্চা। জল টলমল করছে।

কমল এদিক ওদিক চেয়ে চান সেরে নিল।

তারপর গামছাটা ভাল করে শরীরে জড়িয়ে বেরিয়ে এল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে গামছা দিয়ে গা মুছে নিল। কিন্তু শাড়ি বদলাবার উপায় নেই।

যতক্ষণ না শেখর নতুন শাড়ি নিয়ে আসে। ভিজে শাড়িতে কমল অস্বস্তি বোধ করল। কোণের দিকে রাখা টুলের ওপর বসে রইল।

একটু পরেই দরজায় টুকটুক শব্দ। যাক কমল যেন বাঁচল।

দ্রুত পায়ে গিয়ে দরজা খুলে লজ্জায় পড়ল।

চৌকাঠের ওপরে অপরিচিত এক ভদ্রলোক।

শেখর নেই?

কমলের অবস্থা কাহিল। গায়ের ব্লাউজটাও সে খুলে রেখেছে।

ভিজে শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

কমল তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াল।

না, একটু বেরিয়েছেন।

কোন উত্তর নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কমল একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াল।

না, কেউ নেই।

লোকটা জিজ্ঞাসা করেই বোধহয় চলে গেছে।

এমনও হতে পারে, কমলের বিব্রত অবস্থা দেখেই বোধ হয় আর দাঁড়ায়নি।

কমল দরজা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় করাঘাত। কণ্ঠও শোনা গেল।

দরজা খোল। শুনছ।

শেখরের গলা। কমল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

শেখর ঘরের মধ্যে ঢুকল। হাতে মোড়ক।

একটু আগেই যা কাণ্ড হল।

কমলের শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনে শেখর বলল।

কি ব্যাপার, গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিশু চক্রবর্তী এসে হাজির নাকি?

না, না। একটু আগে দরজায় শব্দ হতে খুলেই দেখি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তোমার নাম করে ডাকছিল।

কে? যাত্রার দলের কেউ? কিন্তু এখন তো ডাকবার কথা নয়। কি রকম দেখতে।

আমি কি আর ভাল করে দেখেছি। আমার পরনে ভিজে শাড়ি। লজ্জায় আমি সামনে দাঁড়াতেই পারছি না।

ভিজে শাড়ির কথায় শেখরের খেয়াল হল।

তুমি শাড়িটা বদলে নাও আগে। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

শেখর বাইরে চলে গেল।

যখন আবার সে ফিরে এল, তখন কমলের শাড়িপরা, চুল আঁচড়ানো শেষ।

হ্যাঁ, কি রকম দেখতে লোকটাকে?

একটু বেঁটে আর কালো, এইটুকুই তো দেখতে পেলাম।

ও, বুঝেছি রমেনদা। রমেনদাই হবে।

রমেনদা আবার কে?

মাসিমার ছেলে। ওপরের মাসিমার। বড় ভাল লোক।

আর কোন কথা হল না।

একটু পরে শেখর বলল।

তুমি বস, আমি একবার রমেনদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

শেখর ওপরে চলে গেল।
কমল জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল।
রাত হয়েছে। এখনও রাস্তায় লোক চলাচলের কমতি নেই।
গায়ে এমন সময় গভীর রাত।
পিছনে খুট করে শব্দ হতে কমল ফিরে দাঁড়াল।
দরজার কাছে ওপরের স্থূলকায়া বৌটি দাঁড়িয়েছে।
আসব ভাই?
আসুন। আসুন।
কমল দরজার দিকে এগিয়ে গেল।
বৌটি এসে খাটের ওপর বসল। কমলও বসল পাশে।
আমাদের কর্তারা গল্প করছে বসে, ভাবলাম, তুমি একলা রয়েছ, তাই নেমে এলাম।
ভালই করেছেন।
আচ্ছা ভাই, তুমি শেখর ঠাকুরপোর পার্ট দেখেছ?
কমল কিছু বলল না। মুচকি হাসল।
কি উত্তর দাও? শুধু হাসলে চলবে না।
কমল একটু ভেবে নিয়ে বলল।
যাত্রা শুনি নি, তবে বাসর ঘরে পার্ট শুনেছি।
নিজের অভিনয় ক্ষমতায় কমল নিজেই চমৎকৃত হয়ে গেল।
আহা-হা, শেখর ঠাকুরপো আমাদের চাঁদসদাগরের পার্ট দেখিয়েছিল, কি চমৎকার যে করেছিল।
দরজার কাছে কাশির শব্দ হতেই কমল চমকে উঠল।
বৌটি মুখ ফিরিয়েই হেসে উঠল।
বাবা শেখর ঠাকুরপো বৌ ছেড়ে যে একতিল থাকতে পারে না?
শেখর ঘরের মধ্যে পা রাখতে রাখতে বলল।
আমার কথা কি যেন হচ্ছিল।
তোমার পার্টের প্রশংসা করছিলাম। বৌকে পার্ট দেখাবে তো?
পার্ট দেখানো? একেবারে যাত্রায় নামিয়ে দেব নারীর সাজে।
কি অসভ্য!
কমল ঘোমটার আড়ালে মাথা নাড়ল।
কি আশ্চর্য ওর নিজেরই মনে হচ্ছে শেখরের সঙ্গেই যেন ওর বিয়ে হয়েছে। সে নতুন স্বামীর ঘর করতে এসেছে।
শেখরের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে অন্য একটা মানুষের সংসার ছেড়ে তা যেন মনেই হচ্ছে না।
চল ওপরে, মাসিমা খেতে ডাকছে।
আমি চলি ভাই। মাকে একটু সাহায্য করিগে। তোমরা এস।
বউটি উঠে পড়ল।
বৌটি চলে যেতে শেখর কমলের পাশে এসে দাঁড়াল।
শোন খুব সাবধান, তোমাকে মাসিমা হয়তো কিছু প্রশ্ন করবে।
কমল ভয় পেল।
কি আবার প্রশ্ন?
মারাত্মক কিছু নয়। এই বাপের বাড়ি কোথায়? বাপের নাম কি? ক'ভাই বোন, এই মামুলী প্রশ্ন।
আমি কি বলব?
সত্যি কথাই বল। মিথ্যা কথা বলার অনেক মুশকিল। কখন কি বলেছ, হয়তো মনে থাকবে না। গণ্ডগোল হয়ে যাবে।
তাতে কোন ক্ষতি হবে না তো?

কি আর ক্ষতি হবে। কে যাচ্ছে যাচাই করতে।
ঠিক আছে।
হালকা প্রসাধন সেরে কমল ওপরে উঠে এল। শেখরের সঙ্গে।
মনে হল সবাই যেন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।
মাসিমা বলল।
এস, এস, তোমরা দুজনেই ক্লান্ত। আজ আর বেশি রাত কর না।
একসঙ্গে তিনজন খেতে বসল। কমল, শেখর আর রমেন।
রমেন আর শেখর পাশাপাশি। কমল একটু দূরে।
বিশেষ প্রশ্ন নয়, মাসিমা শুধু জিজ্ঞাসা করল।
বাপের বাড়ি কোথায়?
কমল বাপের বাড়ির গায়ের নাম বলল।
ব্যস, আর কিছু নয়।
জানান্তিকে কমল একবার বৌটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।
আপনি খাবেন না?
বৌটি ঘাড় নেড়েছে।
না ভাই, মাকে সাহায্য করতে হবে।
খাওয়া দাওয়া শেষ করে নেমে আসার মুখে মাসিমা বলল।
সময় পেলেই চলে আসবে ওপরে। আমরাও যাব।
কমল ঘাড় নাড়ল।
সারারাত কমল ঘুমাতে পারল না। শেখর তাকে ঘুমাতে দিল না।
বলল, আজ আমাদের ফুলশয্যা, জানো তো।
অন্ধকারে শেখর দেখতে পেল না। কমলের দুটো চোখ জলে ভরে উঠল।
আর এক ফুলশয্যা স্মরণ করে।
সে ফুলশয্যায় ফুল ছিল। কোমল ফুলের স্তবক, কিন্তু মানুষটা পাষাণ-কঠিন। আর আজ কোন সমারোহ নেই, ফুলের একটি পাপড়িও নয়। কিন্তু মানুষটার তুলনা হয় না।
অবশ্য এত সহজে একটা মানুষকে বিচার করা যায় না। করা সম্ভব নয়। আজ শেখর ভাল আছে। আদরে আদরে কমলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, কিন্তু কিছুদিন পর কমল যখন পরিধেয় বস্ত্রের মতন পুরোনো হয়ে যাবে, দেহের কোন রহস্য আর গোপন থাকবে না, তখন হয়তো শেখর বিশু হয়ে যাবে।
নতুন এক দেহের সন্ধানে পুরোনোকে পরিহার করবে।
পরে কার কি হবে, কিছুই বলা যায় না। বর্তমানই জীবন। কমল দু-হাতে সেই বর্তমানকে আঁকড়ে ধরল।
বাঁচবার আগ্রহ।
বিশুর সংসারে কমল ছমাস ছিল, কিন্তু এখানে পুরো চারটে মাসও কাটল না।
দুদিন হল শেখর নেই। যাত্রাদলের সঙ্গে বাইরে গেছে।
তিন চার জায়গায় ঘুরবে।
কমলের কোন অসুবিধা নেই। মাসিমারা দেখাশুনা করছে।
সময় কাটাচ্ছে সরযু বৌদির সঙ্গে গল্প করে।
এক সন্ধ্যাবেলা। গা ধুয়ে কমল শাড়ি পরছিল, দরজায় ধাক্কা।
শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল।
কে?
দরজাটা খুলুল।
ইদানীং কমল দরজায় একটা ফুটো করে নিয়েছিল। চোখ রাখলে বাইরের লোককে দেখা যায়।
লোকটাকে কমল চিনতে পারল না। ভয়ের কিছু নেই। ওপরে সবাই রয়েছে।
কমল দরজা খুলে দিল।

লোকটি একবার কমলের দিকে চোখ বোলাল, তারপর মুখটা নীচু করে বলল। সর্বনাশ হয়েছে। শেখরদা মারা গেছে।

একটু একটু করে চোখের সামনে কালো একটা ছায়া নেমে আসতে শুরু করল। মাটি দুলছে। একটা কিছু অবলম্বন না পেলে কমল ছিটকে মাটিতে পড়ে যাবে।

কোন রকমে অসংলগ্ন কয়েকটা কথা উচ্চারণ করল।

মারা গেছে, না, না। হতেই পারে না। এ অসম্ভব।

লোকটা কণ্ঠস্বর আরো মৃদু করল।

দাদার দেহ নিয়ে এসেছি।

কমল তীব্র আর্তনাদ করে উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে রমেন নামছিল, সে দ্রুতপায়ে ছুটে এল।

শুধু মুখটা খোলা। সারা দেহ ফুলে বোঝাই। যাত্রার দলের লোকেরা এপাশে ওপাশে বসে রয়েছে।

কমল সব খবর পেল?

গৌতমপুর জমিদার বাড়িতে বায়না ছিল। নলদময়ন্তী পালা। শেখর নল। বই প্রায় শেষ, শুধু একটা দৃশ্য বাকি।

সাজঘরে গরম কালে শেখর বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ পায়ে একটা কি কামড়াল।

প্রথম কয়েক মিনিট শেখর আমল দেয়নি। ভেবেছিল ইঁদুর। কিন্তু একটু পরেই যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।

দলের আর সবাই যখন ছুটে এল, তখন শেখর বিষে অচেতন।

ওঝা এল, ডাক্তার এল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাছেই ইটের পাজা ছিল। কালকেউটের আস্তানা।

সব কথাগুলো কমলের কানে যায় নি, সে তখন মাসিমার কোলের ওপর নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রয়েছে।

মাসিমা খুবকরল। সরযুবৌদিও। সব সময় সঙ্গে রইল। সান্তনা দিল।

বোঝাল অদৃষ্টের ওপর কারো হাত নেই।

কিন্তু এ ভাবে অনন্তকাল চলতে পারে না। কমলের একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রমেন চুপি চুপি বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ফিরল, থম থমে মুখ নিয়ে।

দারুণ ব্যাপার, বুঝলে।

কি হল?

আমি শেখরের মামাত ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

মামাতো ভাই এদের চেনা। কয়েকবার সে শেখরের কাছে এসে থেকেছে। বড় ভাই।

শেখরের বৌয়ের কথা শুনে সেতো অবাক। বললে, শেখর বিয়ে করেছে আর আমরা জানি না। আশ্চর্য কান্ড।

বৌয়ের চেহারার বর্ণনা দিলাম। নামও বললাম, শেখরের মামাতো ভাইয়ের স্ত্রী বলল, সর্বনাশ, আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির বৌ নয় তো? নামে, চেহারায় মিলে যাচ্ছে। আর শেখর ঠাকুরপো যাবার দিন থেকে বৌটাও নিখোঁজ।

রমেন এবার নিজের মতামত দিল।

আমরাও গোড়া থেকে কেমন সন্দেহ করেছিলাম। বৌটাকে নতুন কনে বলে মোটেই মনে হয় নি।

দেখা গেল, এ বিষয়ে মাসিমা আর সরযূবৌদিও একমত। তাদেরও নাকি সমস্ত কেমন সন্দেহজনক মনে হয়েছিল।

রমেন বলল, কাল সকালে শেখরের মামাতো ভাই এখানে আসবে। স্বচক্ষে সব কিছু দেখে যাবার জন্য।

কমল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একলা একলা কমলের ভাল লাগছিল না, তাই সে ওপরে উঠে আসছিল। যেটুকু কানে গেল, সেটুকু যথেষ্ট।

সর্বনাস যখন আসে তখন বুঝি এমনই। একলা নয়, একসঙ্গে একঝাঁক আসে।

পা টিপে টিপে কমল নেমে এল। কাল তার পরীক্ষা। সতীত্বের যাচাই।

তার দুঃখের দিক, বেদনার দিকের কথা কেউ ভাববে না। সবাই আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে, কলঙ্কিনী নারী, একটা সংসার জ্বালিয়ে আর একটা সংসারে ঢুকেছে।

অসতীর পাপে এ সংসারের মানুষটিও শেষ হয়ে গেল।

আলনা থেকে গোটা তিনেক শাড়ি বের করে কমল আর একটা পুরোনো শাড়িতে জড়িয়ে নিল। সেই সঙ্গে ব্লাউস। বাক্স থেকে টাকাগুলো নিল। চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

একবার পিছন ফিরে দেখল। ফেলে যাওয়া ছোট্ট সংসার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে উঠল।

রাস্তায় লোকের কমতি নেই।

কমল হাত নেড়ে একটা সাইকেল রিক্সা থামাল।

কিধার মাইজী?

ষ্টেশন।

কমল নির্দেশ দিয়ে সাইকেল রিক্সায় উঠল।

মজুরীর বিনিময়ে সাইকেল রিক্সা তাকে নৈহাটি ষ্টেশনে নিয়ে যাবে।

ষ্টেশন থেকে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে লাইনে লাইনে যোগাযোগ।

যদি অর্থ থাকে, কমল যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। ট্রেন বদলে বদলে।

ষ্টেশনে খুব ভিড়। ভিড়ই এখন কমলের পছন্দ। তার আত্মগোপনের পক্ষে সুবিধাজনক। তবে আর কেউ তার খোঁজ করবে না।

রাত্রে খাবার সময় তার খোঁজ পড়বে। সুরযুবৌদি রোজকার মতন সিঁড়ির ওপর থেকে তাকে ডাকবে। উত্তর না পেলে হয়তো একতলায় নেমে আসবে।

কিংবা আজ সম্ভবত ডাকবেই না।

কমল দ্বিচারিণী। দ্বিচারিণীর সঙ্গে কোন ভদ্রপরিবার সম্পর্ক রাখতে চায় না।

তারপর কাল শেখরের আত্মীয় এসে দেখবে, ঘর খালি।

তার অনুমানের উত্তর পেয়ে যাবে।

বাড়ির বৌ পালিয়ে এসে আর একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধার চেষ্টা করেছিল।

সামনে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে এখনই ছাড়বে।

কমল টাকা বের করে টিকেট ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কোথায়?

শেয়ালদা।

কিছু না ভেবেই কমল যন্ত্রচালিতের মতন উত্তর দিল।

টিকেট নিয়ে কমল ট্রেনে চেপে বসল।

মহিলাদের কামরায় নয়, কারণ তাদের কৌতূহল বেশি।

পুরুষদের কামরায় এ ঝামেলা নেই।

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে এক পুরোহিত এসে উঠল।

বসল কমলের পাশে, কারণ তা ছাড়া আর জায়গা ছিল না।

গায়ে নামাবলী, কপালে ফোঁটা, শিখাতে ফুল বাঁধা।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে পুরোহিত একটু ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল।

মা জননীর কতদূর যাওয়া হবে?

একটু ইতস্তত করে কমল উত্তর দিল।

শেয়ালদা।

মানে কলকাতা?

কমল ঘাড় নাড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জানালায় মাথা রেখে কমল বাইরের দিকে চোখ রেখে বসে রইল।
দৃশ্যপট দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে।
ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসছে। আবার মিলিয়েও যাচ্ছে।
কমলের দৃষ্টি এসব ছাড়িয়ে অনেক দূরে।
কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে সে বুঝি নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করছে।
সুখ তার কাছে শুধু সুখের ছলনা।
অবশ্য একটা শক্তি চাবুক হাতে করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যতবার সে শান্তির খোঁজে ছায়ার আশ্রয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে, ততবার চাবুকের আঘাতে তাকে বের করে দিচ্ছে পথে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না।
কলকাতায় কোথায় যাবে মা জননী?
পুরোহিত বোধ হয় আগেও একবার প্রশ্নটা করেছিল, কমলের কানে যায় নি।
সে অন্যমনস্ক ছিল। তার ওপর ফেরীওয়ালার চীৎকার।
কিছু বলছেন?
বলছি কোথায় যাবে?
কলকাতার কিছুই কমলের জানা নেই। কোনদিন সে আসেওনি। শুনেছিল দাদারা শ্যামবাজারে থাকত। তারপর চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেছে।
সেইটা মনে করে সে বলল।
শ্যামবাজার।
তাতেও প্রশ্নের শেষ নেই।
দিনকাল খারাপ। রাতের বেলা একলা যাচ্ছ মা?
এর আগে তো মিথ্যা কৈফিয়ত কমলকে দিতে হয়েছে। তাছাড়া অভিনেতা শেখরের সঙ্গে ঘর করে তার একটা শক্তিও বুঝি এসে গেছে।
কমল বলল।
বাবার অসুখ তাই দেখতে যাচ্ছি। সঙ্গে যাবার মতন কেউ নেই।
স্বামী? বলতে গিয়েই পুরোহিত থেমে গেল।
কমলের সিঁথির দিকে তার নজর পড়ল। সাদা সিঁথি।
হাতে একটা চুড়ি রয়েছে। সোনার কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু রঙ্গীন।
ট্রেন যখন শেয়ালদা পৌছল তখন রাত প্রায় দশটা। কমল নামল।
এই পর্যন্ত তার ছক করা ছিল, কিন্তু এরপর!
জনসমাকীর্ণ বিরাট নগরী। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েও কমল শহরের গতিশীলতার আভাস পাচ্ছে। চঞ্চল প্রাণবন্যা বয়ে চলেছে।
কোথায় যাবে কমল?
মা জননী একটা কথা ছিল।
পুরোহিত পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
কমল কিছু বলল না, শুধু চোখ ফেরাল।
আমিও শ্যামবাজারের দিকে যাব। ট্যাক্সিতে যাব। তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, আমার সঙ্গে যেতে পার। যেখানে নামবার নেমে যাবে।
এ ছাড়া কমলের পক্ষে আর উপায়ই বা কি।
একটা রাত না হয় প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তারপর?
তার দেহ আছে, দেহে যৌবন আছে। মাংসলোভী সারমেয়ের অভাব নেই। কি করে কমল নিজেকে বাঁচাবে!
তার চেয়ে ট্যাক্সির মধ্যে পুরোহিতের দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলবে।
বাবা আমাকে বাঁচান। আমাকে আশ্রয় দিন। আপনার বাড়িতে ঝি গিরি করব।
শুধু এক মুঠো অন্ন, মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন আর পশুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আড়াল। আর কিছু দরকার নেই।
ট্যাক্সিতে উঠল দুজনে। মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে যাবার সময় পুরোহিত বলল। রাস্তার

নাম আর বাড়ির নামটা বলে দাও, তোমাকে একেবারে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেব।

কমলকে কিছু আর বলতে হল না নামাবলীর ভিতর থেকে একটা লোমশ হাত এগিয়ে এল। কি একটা চেপে ধরল কমলের নাকে।

উগ্র ঝাঁজ সারা শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল। অন্ধকার নামল চোখের সামনে। কমল চেতনা হারাল।

যখন জ্ঞান ফিরে পেল, দেখল একটা ছোট খাটে শুয়ে আছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। নীলাভ বাতি।

মাথার কাছে একটা প্রৌঢ়া। কমলকে চোখ খুলতে দেখে বলল।

বাঁচালে বাছা, যা ভয় হয়েছিল। ফিটের ব্যামো আছে নাকি; ভাগ্যে বেচারা মোটরে ছিল, নইলে কি কান্ড যে হত।

কমল কথা বলবার চেষ্টা করল, পারল না। শরীরে বেশ দুর্বল মাথাটা ভার। ভাল করে প্রৌঢ়াকে দেখতে লাগল।

কালো রঙ। কাঁচাপাকা চুলের মাঝখানে মোটা সিঁথি। একটা হাতে বিরাট ওজনের একটা অনন্ত দেখা যাচ্ছে। সারা মুখে মেচেতার ছাপ।

কোথায় এল কমল? কার বাড়িতে?

পুরোহিত নাকে একটা অষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল, সেটুকু তার বেশ মনে আছে।

কমলের কাতর অনুনয় বিনয় সব পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল।

পৌঢ়া মিশিমাখা দাঁত বের করে হেসে বলল।

কাকে কি শেখাচ্ছ গো মেয়ে? এই করে আমার ছাপ্পান্নটি বছর কাটল। বাপের অসুখের ছুতো করে কোথায় পালাচ্ছিলে? কোন নাগরের ইশারায়?

এই সব নিয়ে তর্ক করতে কমলের আর ভাল লাগে না।

সত্যিই যদি জিজ্ঞাসা করে, চল, দেখাবে চল, শ্যামবাজারে তোমার বাপের বাড়ি।

কোথায় তোমার অসুস্থ বাপ।

তখন? কমল কি বলবে?

তার চেয়ে ভাগ্য তার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথেই চলুক। এ এক রকম ভাল।

সতীত্বের অপরিসর সড়ক ধরে চলতে হবে না। কোনদিন আর সিঁদুর মোছার প্রয়োজন নেই। অনন্ত সধবা।

প্রতি রাতের শয্যাই ফুলশয্যা। প্রতি রাতেই নতুন জীবন, নতুন পুরুষ।

অন্য সকলের মতন কমলও তো ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

গৃহস্থ-বধূর জীবন যাপন করতে চেয়েছিল।

কিন্তু পুরুষ তাকে পথের ধুলায় নিক্ষেপ করছে।

সেই জন্যেই আজকাল পুরুষের জীবন নষ্ট করতে, তার সংসার ভাঙাতে বদ্ধপরিকর। নিজের দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে পথের মাঝখানে। কামুক সারমেয়র ভোজ্য হিসাবে। তাদের সংসারে, তাদের জীবনে আগুন জ্বলে উঠুক, এইটুকুই কমলের সান্ত্বনা।

সঙ্গিনী জুটে গেল। এক বাড়িরই সবাই। সুখী, নীরজা, আলতা, মাধুরী, পদ্মা। আরো ছিল।

অবস্থা ভাল হতে কেউ বনেদী পাড়ায় উঠে গেছে। আবার ভাগ্য বিপর্যয়ে কেউ কেউ পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলদের পথের ওপর দাঁড়াতে হল না, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে।

তারা সবাই ভিতরের বারান্দায় দাঁড়াল। খদ্দের আনবার লোক আছে। ভজহরি, বিপিন, খোঁনা নিমাই, ইয়াকুব। এরা সব বাবু ধরে নিয়ে আসে। কাছে এসে একবার যাচাই হয়।

গ্যাসের আলো থাকলে অসুবিধা হয় না, কিন্তু কোন কারণে গ্যাস নিবে গেলে, দেশলাই জ্বালে।

খুব মাতাল হয়ে যারা আসে, তাদের একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে কুলোয় না। দু

তিনটি কাঠি খরচ হয়।

কাঁপা হাতে আলো জ্বালাতে দেরী হয়। নানা রকমের লোক আসে, নানা ঢংয়ের।

পৃথিবী এত কুৎসিত, এর আগে কমলের জানা ছিল না।

সুখদা তাকে আশ্বাস দেয়।

তোমার আর ভাবনা কি ভাই, এমন চেহারা, কোন থিয়েটার কিংবা সিনেমার লোকের নজরে ঠিক পড়ে যাবে।

তাহলে কি হবে?

কমলের অজ্ঞতায় সুখদা বিস্মিত হয়।

গালে একটা আঙ্গুল ছুঁইয়ে বলে।

ও মা, কি হবে না, তাই বল। গাড়ি, বাড়ি, লোকলস্কর। চব্বিশ ঘন্টা লোকরা ক্যামেরা এনে ফটাফট ছবি তুলবে। সোমার যেমন হল।

সোমা কে?

সোমা আমাদের এখানেই ছিল। তার নাম অবশ্য তখন ছিল কটা খেঁদী। গায়ের রংটা খুব ফর্সা, নাকটা শুধু একটু চ্যাপ্টা। থিয়েটারের এক বাবুর চোখে পড়ে গেল। ব্যাস, এখান থেকে থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তুলল। তারপর মাসখানেক বাদেই সিনেমায়। এখন টালিগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনেছে, একটা মোটর। চেহারার চটক কি হয়েছে। চেনবারই উপায় নেই। তবে এখনও আমাদের ভোলে নি। আমি আর আলতা কালীঘাটে গিয়েছিলাম, সেখানে তার সঙ্গে দেখা । ছাড়ল না। টেনে মোটরে তুলে ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। সিনেমার নাম বুঝি সোমাদেবী। এক পেট খাওয়াল। মোটরেই আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। একেই বলে বরাত।

কমল চুপ করে সব শুনল।

কমলের কথা এরা শুনেছে। সুখদা, আলতা, নীরজা, সবাই।

ওদের অনেকের ইতিহাসও প্রায় একই ধরনের।

দু-একজনের অবশ্য পাঁকেই জন্ম।

নানা রকমের লোক আসে। ওরই মধ্যে একজনের কথা কমলের বিশেষ করে মনে পড়ে।

একেবারে ছেলেমানুষ নয়। আধাবয়সী। দেখলে পরে মনে হয় বড় ঘরের।

সোনার বোতাম, হীরার আংটি, পোশাকের জাঁকজমকও খুব।

আসে, কিন্তু কমলকে ছোঁয় না। মদের বোতল নিয়ে কার্পেটের ওপর বসে।

দু-এক চুমুক দিয়েই বলে।

জান কমল, আমার জীবনে সুখ নেই। এত টাকা উপায় করলে হবে কি, সংসারে একটু শান্তি নেই।

কমল কিছু বলে না কোন প্রশ্ন করে না। চুপচাপ পাশে বসে থাকে।

লোকটাই বলে যায়।

দজ্জাল পরিবার, বুঝলে একেবারে রণচন্ডী। তাই তোমার কাছে সময়টা কাটিয়ে যাই। কি ইচ্ছা করে জান, ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে হু হু করে কাঁদি। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, তাই জ্বালা জুড়াতে তোমার কাছে আসি।

লোকটা একটানা ছমাস এসেছিল। হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল।

এ পথে হৃদয় সবচেয়ে বড় বাধা। মায়া, মমতা সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

যে ভালবাসে, সে মরে।

আর একজন আসত সিনেমার লোক। হোমরা চোমড়া কেউ নয়।

বেহালা বাজাত। তবে দু-একজন পরিচালকের সঙ্গে চেনাজানা ছিল।

তাকে একদিন কমল বলল।

আমাকে সিনেমায় একটা সুযোগ দিন না।

লোকটা বেহালা নিয়েই আসত।

থুতনিতে বেহালা চেপে আস্তে আস্তে ছড় টানত। করুণ, বিষণ্ন সুর।

বেহালা থামিয়ে বলল।

দুর দুর ও একটা লাইন নাকি? ওখানে যেতে আছে।

কেন বাড়ি, গাড়ি, নাম। খারাপটা কি?

কটা মেয়ের তেমন ভাগ্য হয়। বেশির ভাগই তো এক্সট্রা সেজে দিন কাটায়। তাছাড়া পরিচালকদের ঝোঁক কেবল ভদ্রঘরের মেয়েদের দিকে। তারা লাইন করে দাঁড়ায়। সব বি. এ. এম.এ. পাস। বেশ আছো। তোমরা। খুব ভাল আছো।

আর কমল কিছু বলে নি।

এর মধ্যে মজার ব্যাপারও অনেক হয়েছে।

টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে দুপুর থেকে। যাদের বাবুর মোটর আছে তাদের ভাবনা নেই। বাবুরা ঠিক আসে। বরং বাদলায় জমে ভাল।

কিন্তু যারা সে বরাত করে নি, তাদেরই মুশকিল।

রাত দুপুর পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এ ছাড়া উপায়ও নেই। বাড়িউলি মাসি মাসের শেষে পাওনা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবে। অসুখ হোক ঘর খালি যাক কোন ওজর শুনবে না।

রাস্তার গ্যাসটাও নিভে গেছে। পাশাপাশি তিনজন দাঁড়িয়েছিল।

কমল, নীরজা আর আলতা। আর সবাই যে যার ঘরে দরজা দিয়েছে।

একটা রিক্সা এসে থামল।

যে লোকটা রিক্সা থেকে নামল তার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। দুটো পা-ই টলছে। কোনরকমে দেয়াল ধরে সে এগিয়ে এল।

আসতে আসতে জড়িত কণ্ঠে বলল।

কই বাবা, কাউকেই তো দেখছি না। রিক্সাওলা বললে, ভাল জিনিস আছে এ পাড়ায়। আচ্ছা ভাঁওতা দিলে তো।

ইচ্ছা করেই নীরজা চুড়ির শব্দ কলল। পুনপুন।

ওই তো বাঁশির শব্দ শুনছি, আসল মাল কোথায়?

লোকটা ঠাওর করে করে এসে দাঁড়াল।

কমলরা বুঝতে পারল এবার দেশলাই জ্বেলে তাদের পরীক্ষা করবে।

সবাই আঁচল দিয়ে আলতো করে মুখগুলো একবার মুছে নিল।

কিন্তু না, লোকটা দেশলাই জ্বালাল না।

পকেট থেকেই ছোট একটা টর্চ বের করে টিপল।

আলো খুব জোর নয়, কিন্তু তাতেই মানুষ চেনা গেল।

শুধু কমলকে নয়, কমলও লোকটাকে চিনতে পারল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অস্বাভাবিক রুক্ষ কণ্ঠে বলল।

কে রমেনবাবু নাকি? সরযুবৌদি ভাল আছেন?

রমেন এমন চমকে উঠল যে তার হাত থেকে টর্চ পড়ে কাঁচ ভেঙ্গে চৌচির। অন্ধকার কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

যা বাবা, দিলে নেশাটা মাটি করে। কে তুমি?

শেখরের রক্ষিতা। চিনতে পারছেন?

রমেন আর দাঁড়াল না। টর্চ ফেলে রেখেই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

অন্যমেয়েরা সজোরে হেসে উঠল।

নীলজা বলল।

কিরে কমলি, তোর আগের দিনের নাগর নাকি?

কমল মাথা নড়াল।

না ভাই, ওদের বাড়ির নিচ তলায় ভাড়া ছিলাম। বলেছিলাম না। স্বামীর ঘর ছেড়ে একজনের সঙ্গে পালিয়েছিলাম, তারপর বরাত দোষে লোকটা টিকলো না।

এদের ভয়েই তো বাড়ি ছাড়লাম। অসতী শুনে শিউরে উঠেছিল। আজ আমার দরজায় এসে হাজির।

আলতা বলল।

এ আর বেশি কথা কি। যদি বরাতে থাকে দেখবে তোমার কুলপুরোহিত এসে হাজির হবে। আমার কি হয়েছিল জান?

কি?

স্বামীদেবতা এসে হাজির, যিনি আধমরা করে আমাকে বাড়ির বের করে দিয়েছিলেন।

তারপর?

তারপর আর কি। বললাম, কান ধরে বের করে দেব, না এমনেই যাবে?

কমল ভাবতে শুরু করল।

যদি এক রাতে বিশু চক্রবর্তী এসে দাঁড়ায়। মদ্যপ অবস্থায়।

অবশ্য বিশুকে কমল কোনদিন মদ খেতে দেখে নি।

কিন্তু কটা দিনই বা তার সংসারে কমল ছিল।

যদি বিশু এসে দাঁড়ায় তাহলে কমল কি করবে?

প্রশ্ন করবে, মাতুর কি হল? সে নেই বলেই বুঝি দেহের জ্বালা জুড়াতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে? শরীর ঠান্ডা করার জন্য ।

না, এসব কিছু বলবে না। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

পুরুষদের আবার ভড়ং কত।

কমল আর নীরজা এক শিবমন্দিরে গিয়েছিল।

পুরোহিত হাতে নির্মাল্য দিয়ে বলেছিল।

বাপের নাম বলুন। ভাল করে পূজা দিই।

নীরজা হেসে বলেছিল।

বাপের নাম নেই।

পুরোহিত অবাক।

নেই মানে?

নেই মানে পিতৃকুল তো আর উজ্জ্বল করি নি, কাজেই বাপের নাম উহ্য থাক।

পুরোহিত তারপর এক অদ্ভুত কান্ড করেছিল। সরে গিয়ে বলেছিল। কুলটা। কুলটার মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

কমল কিছু বলেনি। পা টিপে টিপে সরে এসেছিল।

কিন্তু নীরজা ছাড়ল না।

আঁচল কোমরে বেঁধে তৈরি হয়ে নিল।

কুলটা, না? মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে সুখীর ঘরে ঢুকতিস না মুখপোড়া? কিছু জানি না ভেবেছিস? খুব ধর্মের ঢাক বাজাচ্ছিস?

পুরোহিত মন্দির ফেলে পালাল। পালাতে বাধ্য হল, কারণ নীরজার গলার জন্য আশেপাশে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল।

এক রাতে কমলের বরাত খুলল। এতদিনের প্রতীক্ষার বুঝি অবসান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে যাবে কিনা ভেবেছে, এমন সময় বিরাট সাইজের এক মোটর এসে দাঁড়াল।

কুচকুচে কালো রঙ্গের মোটর। উর্দিপরা ড্রাইভার।

আলতা উঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল।

বাবা, কে লাট বেলাট দরজায় এসে থামল রে?

সবাই দরজার মুখে জটলা করল। সে রাতে গ্যাসের বাতির বেশ জোর।

ড্রাইভার দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

ধুতি, পাঞ্জাবী, গলায় কোঁচানো চাদর গৌরকান্তি এক ভদ্রলোক নামল। যৌবনের মধ্যাহ্ন নয়, গোধূলি, কিন্তু অস্তরাগের ছটা সর্বাঙ্গে। শরীরের চমৎকার বাঁধুনি।

লোকটি এগিয়ে আসতেই মেয়ের পাল ছুটে ভিতরে চলে এল।

একটু বুঝতে পারল এ জিনিস এ পাড়ায় নয়।

নেশার মুখে সম্ভবত বাড়ি ভুল করেছে।

লোকটি বার দুয়েক থামল, তারপর হেঁকে বলল।

কিগো, তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমি তো ধরা দিতেই এসেছি।

সব চেয়ে পিছনে ছিল কমল, সে মুখ ফিরিয়ে দেখল।

লোকটি হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে বলল।

শোন, শোন, তোমার ঘরেই বসব। আমার হাতটা একটু ধর। পা দুটো ভারি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

কমল পিছিয়ে এসে লোকটির হাত ধরল।

তারপর সাবধানে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

সারারাত লোকটা রইল। মোটরটাও সারারাত বাইরে রইল।

যাবার সময় বলল।

কমল, আজ থেকে তুমি আমার। তোমাকে আমি মাসে মাসে টাকা দেব। আমার দারোয়ান এখানে থাকবে। তোমার ফাইফরমাস খাটবে। তুমি ওভাবে কারও জন্য আর রাস্তার ধারে অপেক্ষা করবে না।

আনন্দে কমল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

এ লাইনের সকলেরই এ জীবন কাম্য। কার ইচ্ছা করে, এভাবে প্রতি রাত্রে নতুন মানুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবন কাটায়।

কমল লোকটির পায়ের ধুলো নিয়ে বলল।

আপনার দয়া। অধীনাকে পায়ে রাখবেন।

লোকটি হাসল।

আমরা মোহনপুরের ছোট তরফ। এক সময় আমাদের দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত। আজ সে সব কিছু নেই, তবু যা আছে তাই যথেষ্ট। এখনও কলকাতায় আমার ভাগেই গোটা চল্লিশ বাড়ি আছে। মোটা ভাড়া। সাহেব পাড়ায় বাড়ি। দুটো রেসের ঘোড়া আছে।

আপনার বাড়িতে কেউ নেই?

কে আর থাকবে। স্ত্রী গত হয়েছে দশ বছর। একটি ছেলে মেয়ে বিয়ে করে বিলাতেই রয়ে গেল। মেয়েটি ক্রমান্বয়ে স্বামী বদলে চলেছে। সে যে কি চায় ঈশ্বর জানেন। এখন বম্বেতে আছে। চারদিকে আলো ফুটছে, আজ চলি।

যাবার আগে কড়কড়ে পাঁচখানা একশ টাকার নোট কমলের বিছানার ওপর রেখে দিয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যার ঝোঁকে সুখী, নীরজা, আলতা, মানী এরা ডাকতে এসে অপ্রস্তুত হল।

আজ আর আমি যাব না ভাই।

কেনরে? শরীর খারাপ নাকি?

না, শরীর ঠিকই আছে।

তবে?

পায়ে শিকল পরেছি। আর ওড়বার দরকার নেই।

হেঁয়ালি রাখ বাবা, স্পষ্ট কথা বল।

কমল সব বলল।

মুখে খুশির ভাব আনলেও, মেয়েগুলোর বুক জ্বলে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে কমলের একটুও অসুবিধা হল না।

দেখিস কমলি, বাবুকে ভাল করে জড়িয়ে রাখিস। পুরুষ মানুষের ভালবাসা তো হতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।

কিন্তু ভালবাসা গেল না। সপ্তাহে তিন দিন ঠিক আসতে লাগল।

বাবুর নাম ব্রতীনবাবু। কমল ডাকত ছোট বাবু বলে।

তাতেও ব্রতীন বাবু হেসেছে।

আর কেউ বড়বাবু আছে নাকি তোমার জীবনে? কাছের লোক?

মনে মনে বিড় বিড় করে কমল বলেছে।

শেখর আমার বড়বাবু। সবচেয়ে কাছের লোক। জীবনে মরণে। ভালবাসা কি জিনিস সেই আমাকে শিখিয়েছে।

মুখে বলেছে।

বড়বাবু আর কে থাকতে পারে আমাদের মতন লোকের জীবনে। আপনি মোহনপুরের ছোট তরফ তাই ছোটবাবু বলি।

ব্রতীনবাবু খুশি হয়েছে।

বাঃ, বাঃ। তোমার গলাটি মিষ্টি, যে নামে ডাক, তাতেই মিষ্টি লাগে। দেখনা তোমায় রানী করে রাখব।

তা, রেখেও ছিল রানী করে।

একটা নেপালী দারোয়ান বসিয়ে রেখেছিল কমলের ঘরের দারজায়। একবার মুখের কথা খসালেই মোটর এসে দাঁড়াত।

তাছাড়া ব্রতীনবাবু বললো।

তোমাদের একজন বাড়িউলি মাসি থাকে না?

হ্যাঁ, আছে। কেন?

একবার ডাকতে পার।

প্রথমটা কমল অত বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল মাসির কাছে বিলিতী জিনিস লুকানো থাকে। দাঁও মাফিক ছাড়ে। তাই বোধ হয় ছোটবাবুর দরকার।

মাসি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল।

আমারই ভুল হয়ে গেছে বাবা। আপনি আসছেন যাচ্ছেন, আমার এসে একবার দাঁড়ানো উচিত ছিল। এত বড় মানী লোক গরিবের দরজায়। তা আমি আসি নি বটে, কিন্তু কমলির মারফত খবর সব রেখেছি। কমলিকে আপনি পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন–

ব্রতীনবাবু হাত তুলে মাসির বাক্যস্রোত থামিয়ে দিল।

ঠিক আছে। ঠিক আছে।

এলাচ চিবোতে চিবোতে ব্রতীনবাবু আবার বলল।

কমলকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

কপট বিস্ময়ে মাসি বলল।

কোথায় বাবা?

একটু বড় বাড়িতে। এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু ওর পিছনে আমার টাকা খরচ হয়েছে বাবা। ওর তরিবত করতে।

কথার মাঝখানেই মাসি থেমে গেল।

ব্রতীনবাবু হাতে একতোড়া নোট।

দু-হাতের অঞ্জলিতে নোটগুলো নিতে নিতে মাসি বলল।

এতে আর আমি কি বলব বাবা। তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাবে।

খুব দূরে নয়, কাছাকাছিই একটা বাড়ি। একেবারে বড় রাস্তার ওপর।

যাবার সময় আশপাশ থেকে সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুখী, নীরজা, আলতা, মানদা, টুকি, মেন্তি।

সবাইয়ের চোখেই ঈর্ষার জোনাকি। মাসি একেবারে সামনে।

জামাইকে বলবি কমল, এবার পূজোয় আমার ভাল গরদ চাই।

নেপালী দারোয়ান জিনিসপত্র ওঠাতে সাহায্য করল।

নতুন বাড়িতে পা দিয়েই কমল অবাক।

কুঁচি দেওয়া পালিশ চকচকে আলমারি, দামী ড্রেসিং টেবিল, নক্সাকাটা খাট। জানালা, দরজায় মূল্যবান পর্দা।

এই সব আসবাব কমলের ব্যবহারের জন্য? এই ঘরে সে থাকবে? এতদিন পরে নিজের বাপের কথা মনে পড়ল।

ঝুঁকে পড়া চাল, হাজার ফাটল কলঙ্কিত দেয়াল। এতদিনে হয়তো ভৈরব মাস্টার আর নেই। সেই পোড়া বাড়িও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

ভৈরব মাষ্টার বেঁচে থাকলেই বা কি হত!

কমলের এই সুখ, এই সম্পদ দেখলে লোকটা কি খুশি হত!
কিসের বিনিময়ে এই সম্পদ জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে পৈতা ছিঁড়ে অভিশাপ দিত।
কিংবা সোজা গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিত। আর উঠত না।
এখানে পুরোনো পাড়ার মেয়েরা এসেছে।
দুপুর বেলা চটি ফটফট করতে করতে। একটা বাঁধা ঝি ছিল কমলের।
তাকে দিয়ে প্রচুর খাবার এনে কমল খাইয়েছে। রাংতা মোড়া পান।
মাঝে মাঝে মাসিও এসেছে। হেঁটে নয় রিক্সায়।
রাস্তা থেকেই হাঁক পেড়েছে।
অ কমলি, এ মুখপোড়াকে পয়সা কটা দিয়ে দে মা। এখনই চেঁচাতে শুরু করবে।
তারপর ঠান্ডা মেঝের ওপর বসে নিজের পানের বাটা খুলে গুঁড়ী দেওয়া পান মুখে দিয়ে বলেছে।
মানুষের ভাল হতে দেখলেও বড় আনন্দ হয়। বেঁচে থাকো দুজন।
তারপর সুর একটু নামিয়ে বলেছে।
শ'খানেক টাকা হবে কমলি তোর কাছে?
শ' খানেক? অতো তো হবে না।
পঞ্চাশ টাকা? তা খুব হবে।
কি হবে টাকা দিয়ে?
মেয়ে লিখেছে দেশ থেকে। জামাইয়ের খুব ব্যামো।
জীবনের বিচিত্ররূপ দেখে কমল কঠিন হয়ে গেছে। অনুভূতি রীতিমত ভোঁতা। সে বলল।
নিজের মেয়েকে বুঝি এ ব্যবসায় নামাও নি মাসি?
মাসি একটু দম নিল। কষ্টে রাগ সামলালো।
উপায় নেই। যে গরু দুধ দেয়, তার চোট খেতে হয় বৈকি!
দে মা, যা দিবি দে। আমার আবার তাড়া আছে।
আলমারি খুলে কমল পাঁচখানা দশটাকার নোট বের করে দিয়েছিল।
মাঝে মাঝে কমলের অদ্ভুত এক ইচ্ছা হয়েছে।
কিছু টাকা ভৈরব মাষ্টারের নামে পাঠিয়ে দিতে।
কমলের নামে পাঠালে সে টাকা হয়তো ভৈরব মাষ্টর ছোঁবে না।
কারণ, বিশু চক্রবর্তী নিশ্চয় এতদিনে ভৈরব মাষ্টরের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছে।
ভৈরব মাষ্টারের মেয়ে যে আর তার সংসারে নেই, এমনই মুখরোচক সংবাদ। কার সঙ্গে কমল ঘর ছেড়েছে, সে খবরও কারো অজানা নেই।
কাজেই গৃহত্যাগিনীর পাঠানো টাকা নিশ্চয় আদর্শবাদী ভৈরব মাষ্টার ছোঁবে না। তার চেয়ে কোন যোগাযোগের চেষ্টা না করাই ভাল।
একদিন সব শেষ হয়ে গেল। পর পর দুসপ্তাহ ছোটবাবু এল না।
সেজেগুজে দরজায় অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে ঘরের মধ্যে এসে শুয়ে পড়ল। মানুষের শরীর। তার ওপর বয়সও হয়েছে। অসুখ বিসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়। তৃতীয় সপ্তাহে খিজে জিজ্ঞাসা করল।
[illegible] চিনি না। [illegible] করব?
[illegible] বলে ছিল [illegible] ইদানীং প্রত্যেকদিন আসেও না। কমল বলল
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কমল এগিয়ে এল।
কি ব্যাপার?
নমস্কার করে ম্যানেজার বলল।
আমরা হুকুমের চাকর মা। বাবুর হুকুম হয়েছে এসব সরিয়ে নিয়ে যেতে।
ছোটবাবু আর আসবেন না?
বোধ হয় না। বাবু গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নিয়েছেন।
মন্ত্র?
হ্যাঁ মা। বয়স তো হচ্ছে। আর কতদিন কাদা ঘাঁটবেন।
আসবাব গেল। বাকি রইল ভাড়া বাড়িটা।
সে কথাও ম্যানেজার বলল।
এ মাসের ভাড়াটা তো দেওয়াই আছে। মাস শেষ হতে এখনও সতেরো দিন বাকি।
তার মধ্যে আপনার ব্যবস্থাটা করে ফেলবেন।
খালি ঘরের মেঝের ওপর কমল চুপচাপ বসে রইল।
আলোর জীবন শেষ হল, আবার অন্ধকার জীবনে ফিরে যেতে হবে।
আসল খবরও পাওয়া গেল দিন সাতেক পরে।
রাল্লের মা-ই খবর আনল।
ছোটবাবু নতুন শিকার ধরেছেন। নতুন এলাকায় কম বয়সী মেয়ে।
শেখর চলে যাবার দিন কমলের বুক ফেটে গিয়েছিল। চোখের জলে পৃথিবী ঝাপসা। আজ আবার নতুন করে চোখের জলে বুক ভাসল।
সুখী জীবনে অভ্যস্ত কমল কি করে আবার রং মেখে রাস্তায় দাঁড়াবে। অন্য সব মেয়েদের বাঁকা হাসি পার হয়ে। কিন্তু নিরুপায়।
মানুষ ভাগ্য গড়ে এর চেয়ে মিথ্যা কথা আর নেই। ভাগ্যই মানুষকে হাত ধরে ঐশ্বর্যের শিখরে তোলে, হতাশার অন্ধকারে নামায়।
এই রীতি। পুরানো ঘর খালি ছিল না।
কোণের দিকে একটা ঘরে কমল ফিরে গেল।
তার কিছু জমানো টাকা ছিল। কয়েকটা মাস হয়তো চলবে।
আশ্চর্য তাকে দেখে কোন মেয়ে টিটকারি দিল না।
এ গলির ওঠানামার সঙ্গে সবাই পরিচিত।
তাই কেউ কেউ হয়তো সাময়িক একটু ঈর্ষাভাবাপন্ন হয়, কিন্তু বিশেষ বিস্মিত হয় না।
নিজের জীবিকার জন্য নয়, কমলের জীবনে আর এক বিপদের ছায়া ঘনিয়ে এল।
প্রথম কয় মাস ঠিক বুঝতে পারে নি, তারপর একদিন আলতাকে বলল।
আলতা বলল।
সর্বনাশ হয়েছে। ও তো খারাপ রোগ। তুই এতদিন চেপে আছিস কেন? ডাক্তার দেখা।
কাকে দেখাই বল তো?
[illegible] বল। মাসির বাঁধা আছে ডাক্তার বিশ্বাস।
ডাক্তার বিশ্বাসকেই দেখাস।
এ পাড়ায় ডাক্তার বিশ্বাসের বদনাম আছে। রোগীদের হাতে রেখে চিকিৎসা করে। কমলকে [illegible] মুখ টিপে হাসল।
[illegible]
[illegible] কেউ [illegible]
[illegible] এগিয়ে [illegible] বলল।
[illegible] হাতধরা।
বিশ্বাস খাঁকশেয়ালের [illegible] দন্ত বিস্তার করে।
বস, বস, সব ঠিক হবে। কমল [illegible] বলল।

বিশ্বাস বলল।

প্রত্যেক তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করতে হয়। এই তীর্থে ওই রোগটুকুই পুণ্য। ওটা না হলে মোক্ষ হবে কি করে।

কমল মাথা নীচু করে রইল।

তোমার ছোটবাবুর দান, বুঝলে কমল। সম্পদের সঙ্গে ওটুকুও দিয়ে গেছেন। আবার সেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি।

ওষুধ বলল। ইনজেকশন। একদিন অন্তর।

মাসি এসে দরজায় দাঁড়াল।

একটা কথা ছিল বাছা।

কমল পুরানো একটা শাড়ি সেলাই করছিল। মুখ তুলে দেখল।

তুমি নীচের ওই ছোট ঘরটায় বরং চলে যাও।

কমল অবাক হল।

নীচের ছোট ঘরটায়? ওটায় তো জানালা নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আর আলো কি করবে? অন্ধকারেই তো ভাল। যা রোগ করেছ, মানুষের কাছে মুখ দেখিয়ে আর কি হবে!

তর্ক করে লাভ নেই। এ বাড়িতে মাসির কথাই শেষ কথা।

জিনিসপত্র নিয়ে কমল নীচে চলে এল।

আগে এ ঘরে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র থাকত। মাসি সে সব সরিয়ে কমলের জায়গা করে দিয়েছে।

কমলের একমাত্র ভরসা, চিরদিন এ ঘরে থাকতে হবে না

নিরাময় হয়ে গেলেই আবার ভাল জায়গায় তার ঠাঁই হবে।

সন্ধ্যাবেলা সাজগোজ করার মুখেই আবার মাসির সঙ্গে দেখা।

তুমি রাস্তায় দাঁড়াচ্ছ নাকি?

এ আবার কি প্রশ্ন!

কমলের জীবিকার পরিচয় কি মাসিকে নতুন করে দিতে হবে।

এই রোগ নিয়ে দাঁড়িয়ো না বাছা। আমার বাড়ির বদনাম হবে।

একটু চুপ করে থেকে কমল বলল।

আমার চিকিৎসার খরচ চলবে কি করে?

সে তুমি জান? জমানো টাকায় হাত দাও। তোমার যা ইচ্ছা কর, কিন্তু দেখ, এ বাড়িতে খদ্দের আসা যেন বন্ধ না হয়।

কমল ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল।

নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাকে সে দোষ দেবে।

ঘর বাঁধা, ঘর ভাঙার খেলা শেষ। এবার দেহ এ জীবিকার উপজীব্য, সে দেহ কীটদষ্ট হতে চলেছে।

দু একদিন পর।

সকালে স্নান সেরে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়েই কমল চমকে উঠল।

সারা মুখে লাল লাল দাগ। অনেকটা বসন্তের চিহ্নের মতন। কিন্তু বসন্তের গুটি নয়। কমল ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে ছুটল।

যখন ফিরল, তখন তার সারা মুখ থমথমে।

রোগের বিস্তার ঘটছে। ইনজেকশন চলবে। আর কিছু করার নেই।

ওপরের দিকে কমল অসহায় দৃষ্টি বোলাল। না, কোথাও কিছু নেই।

চাঁপার মতন পরনের শাড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়া যায় না।

জীবন থেকে মুক্তি। জীবিকা থেকেও।

আরো অন্ধকার কোনে কমল সরে গেল।

যে বুড়ি দুবেলা খাবার নিয়ে আসে, সে দেখতে না পায়।

তাহলেই সারা বাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

দল বেঁধে সবাই দেখতে আসবে।

কিংবা কেউই হয়তো আসবে না। এ জীবিকায় এটা খুবই পরিচিত দৃশ্য।

এ অসুস্থতা আবার সারবে এমন আশা কম।

সারাটা জীবন এই গলিত দেহ নিয়ে হয়তো কাটাতে হবে। একদিন যারা সারা দেহের স্তুতিগান গাইত, তারাই দেহের এই বিকৃত রূপ দেখে শিউরে মরে যাবে।

চোখ বন্ধ করলেই পুরুষদের ছবি ভেসে আসে।

বিশু, শেখর, রমেন, ছোটবাবু আরো অনেকে।

দেহের গন্ধ শুঁকে শুঁকে যারা হাজির হত।

কিন্তু শেখর বোধ হয় এ দলের নয়।

অনাবিল ভালবাসা দিয়ে সে কমলকে কটা মাস আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পুরুষদের সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে শেখরও হয়তো ছোটবাবু হয়ে যেত। নতুন শরীরের খোঁজে নতুন জায়গায় ছুটত।

ভাল করে কমল চোখ তুলেও দেখতে পায় না।

এখানে বসে বসেই শোনে, বাইরে মেয়েদের হাসি, চীৎকার।

অশ্লীল রসিকতা। গ্লাসের ঠুং ঠাং, মদ্যপের বেসুরো গলায় গান।

কমলের জীবন থেকে সব আলো, সব সুরের বিরতি।

এদিকে ওরা কেউ আসে না।

বোধ হয় কমলের মধ্যে ওদের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পাবে বলে ভয় পায়। বাইরে খুট খুট শব্দ।

ভারি জুতা পরে কে যেন এগিয়ে আসছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে কমল চুপচাপ বসেছিল।

আজকাল আর সে ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে যায় না।

তার ওষুধে কাজ হয় না। কিংবা ঠিক ওষুধ সে আর দেয় না।

তাছাড়া, কমলের পুঁজি শেষ। আহার্য জুটবে কিনা তারই ঠিক নেই,এর উপর চিকিৎসা বিলাসের কোন মানে হয়!

কোন পুরুষ মানুষের পায়ের শব্দ বলেই মনে হল।

এতদিন পরে কে আসছে?

বিশু কি বৌয়ের খোঁজ পেয়েছে? মাতুর দুর্বার যৌবন ধসে গেছে বলে বুঝি কমলের কথা মনে পড়েছে।

আবার ঘুরে ফিরে রমেন এল? একবার ফিরিয়ে দিয়েছে বলে আর একবার চেষ্টা করতে এসেছে।

এমন তো নয়, ছোটবাবু এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের সর্বনাশের চেহারাটা দেখতে। পায়ের শব্দ আরো কাছে। কমল উঠে দাঁড়াল

কে? কে ওখানে?

একটা ছায়া দরজার ওপর।

আমি মাইজী।

নেপালী দারোয়ান দিলবাহাদুর এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি?

শুনলাম আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মাইজী, তাই ভাবলাম একবার দেখে যাই।

ছোটবাবু কোথায়?

ছোটবাবু পার্কসার্কাসে একটা ঘর নিয়ে আছেন। আমি তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়েছি মাইজী। এ বয়সে নোংরা ঘাঁটতে আর ইচ্ছা করে না।

দিলবাহাদুর ইচ্ছা করলেই এই ক্লেদাক্ত জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কমল পারে না। সারাটা জীবন তাকে কাদায় গড়াগড়ি দিতে হবে। পরিত্রাণ নেই।

ঘন জমাট অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে বিমূঢ় কমল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সেই আমি

ডায়রি লেখার অভ্যেস আমার নেই। চিঠিপত্রও কম লিখি। স্মৃতিশক্তিও তেমন ভাল নয়-সুতরাং যে-জীবন পিছনে ফেলে আসছি, তা হারিয়েই যায়। যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি।

চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের সময় কিছুদিন ডায়রি লিখেছিলাম। একটি বেশ সুন্দর করে বাঁধানো বিলিতি কম্পানির বার্ষিক ডায়রি বই, কে আমাকে সেটা দিয়েছিল কিছু মনে নেই।

ঐ বয়সের ছেলের পক্ষে অমন সুন্দর একটা জিনিস পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমার এতদিন ধারণা ছিল সেই ডায়রিটা হারিয়ে গেছে। অতদিন আগেকার কোন জিনিসই আমার নেই। কিন্তু হঠাৎ সেটা পেয়ে গেলাম। ছাদের সিঁড়িতে দু'তিনটে লোহার ট্রাংকে পড়ে আছে বহুদিন থেকে, সেটার পেছনে ইঁদুর আর আরশোলার বাসা। মরচে লেগে ট্রাংকগুলো ঝরঝরে হয়ে গেছে, সেদিন সেগুলো রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে ঠিক হল। তার আগে খুলে ভেতরে অনেক হাবি-জিনিসের সঙ্গে একটা কাগজেমোড়া প্যাকেট পাওয়া গেল। সেই প্যাকেটে আমার চৌদ্দ বছরের ডায়রি।

পাছে কেউ সেটা দেখে ফেলে, তাই অতি সাবধানে আমি ঐ টিনের ট্রাংকে রেখেছিলাম। কিছুদিন পর নিজেই ভুলে গেছি। এর আগে কেউ দেখে ফেললে সত্যিই কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। কেননা ডায়রিতে অনেক অসভ্য কথা লেখা আছে।

ডায়রিটা পড়তে পড়তে একটা সকাল বেশ আনন্দে কেটে গেল। নিজের কোন লেখা আমি এত আগ্রহের সঙ্গে পড়িনি। পড়তে পড়তে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম একেবারে।

আমার সেই চৌদ্দ-পনেরো বছরের চেহারা ও মানসিকতা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে আমি একলা একলা হাসতে লাগলাম। সেই আমি আর এখনকার আমি মুখোমুখি-দু'জনের মধ্যে তেমন অমিল আছে বলে মনে হয় না। এই দু'জনকে পাশাপাশি দেখতে অন্য কেউচিনতেই পারবে না-কিন্তু আমি চিনতে পারছি। আমার এখন আটত্রিশ বছর বয়েস, তেইশ বছর আগে খুব একটা অন্যরকম ছিলাম না।

ডায়রিটার মধ্যে আর একটা আশ্চর্য জিনিস রয়েছে, সেটা আগেই বলে রাখি। ডায়রির মধ্যে রাখা আছে একছড়া বেলফুলের মালা। বেলফুল যে এতদিন টিকে থাকে, আমার ধারণা ছিল না। শুকিয়ে কাগজের মতন হয়ে গেছে-কিন্তু মালাটা অক্ষতই আছে, পচে গলে নষ্ট হয়ে যায় নি। হাত দিয়ে তোলা যায়, কারুর গলায় পরিয়েও দেওয়া যায়।

বয়স্ক লোকেরা মনে করে, চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েরা জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, কিছুই বোঝেনা তারা। আসলে, প্রত্যেকেই নিজের শৈশবের কথা ভুলে যায়। মনে রাখে নিজের পছন্দমতন শৈশব-স্মৃতি যা আসলে সত্যি নয়।

আমার ডায়রিতে দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু সম্পর্কেই আমার টনটনে জ্ঞান ছিল।

রীতিমতন ইঁচড়ে-পাকা ছিলাম বলা যায়। সেই পনেরো বছরেই আমি তিনজন নারীর প্রেমে পড়েছিলাম।

ডায়রি বইখানাতে এক একদিন এক এক পাতা লিখেছিলাম। কিন্তু লেখাগুলো এক মাপের নয়। কোন কোন দিন দু-তিন লাইনে সারা হয়েছে। কোন দিন আবার পুরো পাতা লিখেও তলায় লেখা রয়েছে এর পর ৭৭নং পৃষ্ঠায়।

দু'একটা সাংকেতিক শব্দও রয়েছে। যেমন একজনের নাম কখনো লেখা হয়নি, শুধু লেখা আছে 'পু'। ইনি আমার একজন আত্মীয়া, আমার থেকে এগারো বছরের বড় আমার প্রথম প্রেমিকা। যদিও উণি নিজে তা আজও জানেন না। সেই বয়েসে পূরবী কাকিমা ছিলেন আমার চোখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দর।

আমার দ্বিতীয় প্রেমিকার নাম তৃপ্তি। ও থাকত আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে, আমারই সমবয়েসী। আমি ওর কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম-ডায়রিতে নাম দেখেও প্রথমটায় চিনতে পারিনি। অথচ এক সময় খুবই ভাব ছিল।

আর একজন প্রেমিকার নাম টুলটুল, ভালো নামটা জানাচ্ছি না-কারণ অনেকে চিনে ফেলতে পারে-কোন কারণে বিখ্যাত হবার ফলে এখন টুলটুলের নাম প্রায়ই খবরের

কাগজে বেরোয়। টুলটুল আমার এক বন্ধুর বোন-বেশ কয়েক বছর ওর সঙ্গে আমার প্রেম-প্রেম ব্যাপার ছিল, ও আমাকে অনেক ক: দিয়েছে।

ঐ টুকু বয়েসে একসঙ্গে তিন-তিনজন প্রেমিকাকে নিয়ে আমি সামলাতাম কি করে। বেশ ধুরন্ধর ছেলেই ছিলাম বোঝা যাচ্ছে।

পূরবী কাকিমার সঙ্গে অবশ্য প্রত্যেকদিন দেখা হত না। উনি থাকতেন আমহার্স্ট ষ্ট্রিটে। তবে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই আমি ও বাড়িতে যেতাম। আর কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই. কিন্তু পূরবী কাকিমার কথায় পাতার পর পাতা ভর্তি হয়েছে। পূরবী কাকিমা আমায় খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু উনি তো জানতেন না যে, ওর ঐ খাদে আত্মীয়টি ওর একজন প্রেমিক। আমি যে পূরবী কাকিমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম, সেটা আসলে আমার রূপতৃষ্ণা। আমার মনে একটা অপরাধবোধও ছিল, কেননা পূরবী কাকিমার পুরো নাম না লিখে শুধু পূ-লিখতাম কেন? একদিন এ কথাও লেখা আছে। 'পূ'র গায়ে কি সুন্দর গন্ধ! আজ পূ'র খুব কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, গা থেকে ঠিক কেয়াফুলের গন্ধ আসছিল।'

পূরবী কাকিমার গায়ের রং বেশ ফর্সা ছিল, চুলগুলো কোঁকড়া, মুখখানা দেবী দেবী ধরনের। একবার দুর্গাপূজোর সময় ব্যাগবাজার সার্বজনীনের দুর্গাঠাকুরের মুখখানা অবিকল পূরবী কাকিমার মতন মনে হয়েছিল।

আমার এই ডায়রিখানা এখন হুবহু ছাপিয়ে দিলে নির্ঘাৎ অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত হবে। পনেরো বছরের ছেলে তো রেখে -ঢেকে কায়দা-কানুন করে লিখতে জানে না, যখন যা মনে এসেছে তাই ঠিক-ঠাক লিখে গেছে। কৈশোর কালটা নিষ্পাপ বলেই সবাই মনে করে, কিন্তু প্রথম যৌনক্ষুধা জাগার পর সেই সময়টা যে কি ভয়ঙ্কর হয়-সেটা সবাই গোপন করে যায়। ডায়রিটা পড়তে পড়তে এক এক সময় আমার নিজেরই লজ্জায় কান লাল হয়ে যাচ্ছিল।

শুধু যে মেয়েদের কথাই আছে তাই নয়! সুভাষ বোষের কথাও আছে পাতার পর পাতা। ছেলেবেলায় আমি নেতাজীর দারুণ ভক্ত ছিলাম-উনি ছিলেন আমার আদর্শ। একটু বড় হয়ে আমি যে নেতাজীকে খুঁজে আনতে যাব এরকম একটা প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম দেখছি। এখন সে-সব চুকে -বুকে গেছে। আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পর্কেও অনেক কথা আছে, যে এখন আর বন্ধু নয়। তবে মেয়েদের কথাই বেশি।

সেই বয়েসে আমাকে কেউ খারাপ কথা বলত না। লেখাপড়াতে মোটামুটি ভালই ছিলাম, স্কুলের বাথরুমের দেয়ালে কখনো খারাপ কথা লিখিনি, লাষ্ট বেঞ্চের ছেলেদের মতন গল্পও করতাম না। লোকে আমাকে লাজুক আর ভদ্র স্বভাবের বলেই জানত। অর্থাৎ আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতনই ছিলাম। ভাগ্যিস অন্য কেউ আমার ডায়রি পড়েনি। পূরবী কাকিমা বাথরুমে গিয়েছিলেন, আমি একদিন বাথরুমের দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবতে গিয়ে এখন আমার কান লাল হয়ে যাচ্ছে। একদিনের একটা পুরো পাতায় শুধু এক লাইন লেখা আছে। 'টুলটুলের সঙ্গে আজ আমার তিনবার দেখা হয়েছে।' শুধু এই টুকুই, কোথায় দেখা হল, দেখা হবার পর কি কি ঘটল-তার কিছুই উল্লেখ নেই। শুধু দেখা হওয়াই যেন একটা মহা আনন্দের ব্যাপার, আর কিছু লেখার দরকার নেই। সেদিনের ঘটনা আমার আজ কিচ্ছু মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, টুলটুলের সঙ্গে আমার স্কুলে যাবার পথে রোজই দেখা হত। আমাকে স্কুলে যেতে হত ওদের বাড়ি পেরিয়ে-যাবার পথে কিংবা ওদের বাড়ির সামনে দেখতাম টুলটুলকে। ওরও তখন স্কুলে যাবার সময়। অনেক বয়েস পর্যন্ত ফ্রক পরত টুলটুল, আমি ওকে শাড়ি পরে কখনো স্কুলে যেতে দেখিনি। ওর চেহারার কথা ভাবলে, একটা গোলাপী ফ্রক পরা চেহারাই শুধু মনে পড়ে। অথচ একটাই তো মোটে ফ্রক ছিল না টুলটুলের।

দুটি সাদা পাতার পর লেখা, 'আজও আমার জ্বর ছাড়েনি। ভাত খাওয়ার পরই জ্বর এসেছিল। একটাও গল্পের বই নেই। কেউ দেখা করতেও আসে নি।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আমি তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম খুব। এখন ম্যালেরিয়া নামটাই অনেকের কাছে অচেনা। কিন্তু একসময় এই ম্যালেরিয়া ছিল বাংলাদেশের জাতীয় অসুখ। দেশের সমস্ত পুকুর আর খাল-বিল ভরা ছিল কচুরিপানায়। সেই খানে জন্মাত মশা-সেই

মশা বয়ে নিয়ে আসত ম্যালেরিয়ার জীবাণু। কুইনিন নামে অসম্ভব তেঁতো বড়িই ছিল এর একমাত্র ওষুধ, তাও সব সময় পাওয়া যেত না। যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা এসে এই রোগে বিব্রত হয়ে কচুরিপানা ধ্বংসে লেগে যায়। তারাই ছাড়ে সস্তায় নতুন ওষুধ প্যালুড্রিন–সেই প্যালুড্রিনের তাড়াতেই ম্যালেরিয়া এখন এদেশ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আমাদের স্কুল থেকে একবার এক্সকারশানে যাওয়া হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারে। একটা স্কুল বাড়িতে ছিলাম। সেইখান থেকেই আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। অসুখটা বড় দুঃখ দিয়েছিল। কথা নেই বার্তা নেই কাঁপনি দিয়ে জ্বর-তখন এত শীত করে যে যত কাঁথা কম্বল লেপ আছে সব চাপা দিলেও শীত কমে না। কয়েক ঘন্টা বাদেই কিন্তু জ্বর ছেড়ে যায়। পরদিন ঠিক ঐ সময় আবার। কয়েকদিন পর একদিন জ্বর থেমে গেল। মনে হল, সেরে গেছে। পরের দিনও আর জ্বর নেই। তারপর দিন ভাত খেয়ে শরীরটা বেশ সুস্থ লাগছে। বিকেলে আবার চোখ ছলছল করে জল এল, তারপরেই সেই অসহ্য শীত। এই রকম সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এই অসুখটাতে মন খারাপ হয়ে যেত বেশি-কারণ মাঝে মাঝে সেরে যাবার ছলনা দেখাত। এই অসুখের সময় খুব একলা একলা লাগত-বন্ধু টন্ধুদের কাছে আসতে দেওয়া হত না, যদি ছোঁয়াচ লাগে! দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা-অথচ যে সময় জ্বর থাকে না, সে সময় শরীরটা খুব দুর্বল থাকে। না, সে মাস দু'এক ভোগার পর প্যালুড্রিন খেয়ে আমার ম্যালেরিয়া ছেড়েছিল।

পরের দিন লেখা, 'টুলটুল একটা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বই পাঠিয়েছে। তার মধ্যে একটা চিঠি! টুলটুল ন'দিন পর আমার চিঠির উত্তর দিল। টুলটুল বিকুদাদের সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্স-এ মেলা দেখতে গিয়েছিল.....

টুলটুলের সঙ্গে ছিল আমার চিঠি লেখার খেলা। দেখা হলে টুলটুলের সঙ্গে প্রায়ই কোন কথা বলা হত না– আমি খুব লাজুক ছিলাম তো–কিন্তু টুলটুলকে আমি প্রায় আড়াই শো চিঠি লিখেছিলাম সবসুদ্ধ। তার উত্তরে টুলটুলও লিখেছিল প্রায় শ'দেড়েক চিঠি। আমার চিঠিগুলো হত খুব লম্বা লম্বা-কোন গল্পের বইতে ভাল লাইন পড়লে সেটাও টুকে দিতাম চিঠিতে। টুলটুলের উত্তরগুলো হত প্রায়ই সংক্ষিপ্ত কিন্তু দারুণ ভালো লাগত। যেমন টুলটুল একদিন একটা মস্ত বড় সাদা কাগজের মাঝখানে শুধু একলাইন লিখেছিল, 'চারদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি– আমার মন কেমন করে না বুঝি?' টুলটুল মাঝে মাঝে চিঠির বদলে ছবি এঁকেও পাঠাত– তখন থেকেই ওর ছবি আঁকার হাত বেশ ভাল। একবার একটা ছবিতে এঁকেছিল, একটা বিশাল পাহাড়ের গায়ে আমার মুখখানা উৎকীর্ণ। এখনকার ছেলেমেয়েরা টেলিফোনে প্রেমালাপ করে। আমাদের বাড়িতে কিংবা টুলটুলদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। আমরা চিঠি লিখতাম। টুলটুলকে আমি কখনো জড়িয়ে ধরি নি, কখনো চুমু খাইনি– কিন্তু চিঠিতে কত প্রেমের কথা জানিয়েছি।

অথচ, প্রেমের ব্যাপারে আমি একনিষ্ঠ ছিলাম না দেখতে পাচ্ছি। পূরবী কাকিমার প্রতি ছিল আমার শ্রদ্ধা-মেশানো ভালবাসা। সেই বয়সের ছেলেরা কোন একজন নারীকে মনে মনে পূজো করতে চায়–সমবয়সী বা বয়সে ছোট কোন মেয়ে সম্পর্কে সেটা সম্ভব হয় না-পূরবী কাকিমাকে আমি সেইরকম পূজো করতাম। উনি যদি তখন আমাকে বলতেন, নীলু, তুই আমার জন্য প্রাণ দিতে পারবি? আমি তাহলে তক্ষুণি প্রাণ দিতে রাজি ছিলাম। কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, এমনিই। পূরবী কাকীমার শারীরিক রূপ সম্বন্ধেও যে আমার কৌতূহল ছিল, সেটাকেও খুব অস্বাভাবিক বলা যায় না। সংস্কৃত কবিরাও তো দেবী সরস্বতীর পূজার মন্ত্রে তাঁর রূপের বর্ণনা করেছেন।

তৃপ্তি সম্পর্কে ছিল আমার এক ধরনের ভালবাসাহীন আকর্ষণ। তৃপ্তিকে কখনো আমি চিঠি লিখিনি। তৃপ্তি লেখাপড়ায় মোটেই ভাল ছিল না, গল্পের বই-টই পড়ার অভ্যেস ছিল না একেবারে। সরল সাদাসিধে মেয়ে, ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখলে বোঝা যেত, ও যেন গিন্নীবান্নি হবার জন্যেই জন্মেছে।

বয়সের তুলনায় তৃপ্তির চেহারাটা ছিল পুরন্ত। মাঝে মাঝে শাড়ী পরত। যখন-তখন ওকে জড়িয়ে ধরলে ও একটুও আপত্তি করতো না, বরং পোষাবেড়ালের মতন গায়ের সঙ্গে মিশে যেতে চাইত।

তবে, তৃপ্তির একটা অদ্ভুত দোষও ছিল। আদর-করার পর ও হঠাৎ বলত, মাকে বলে দেব। তুই অসভ্য!

শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে যেত তখন। আমি কাতরভাবে তৃপ্তির দিকে চাইতাম। তৃপ্তি এমন ভাব দেখাত যে যেন সব দোষই আমার-ওর কোন দোষই নেই। শুধু ভাব দেখাত না, ও বিশ্বাসই করত যে ছেলেদের পক্ষেই এসব কাজ করা খারাপ, মেয়েদের কোন দোষ হয় না। আমার অনুরোধে ও ব্লাউজের একটা বোতাম খুলেছিল–কিন্তু পরে সেই নিয়েই অভিযোগ করেছে, খুলতে বললি কেন তুই?

তৃপ্তি অবশ্য সত্যি সত্যি কারুকে কোনদিন বলে নি। ভয় দেখায় শুধু! তিন-চারদিন আমি ভয়ে ভয়ে ওর সঙ্গে কথাই বলতাম না। ও নিজে থেকেই নানা ছল-ছুতো করে আসত আমাদের বাড়িতে। আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াত। আমি ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরলে ফিক ফিক করে হেসে বলত, তুই বড় অসভ্য!

আর বিশেষ কিছু না, শুধু ঐ কোমর জড়িয়ে ধরা, বা একবার গালে গাল ছোঁয়ানো এতেই আমার সারা শরীর দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুত, আমি সরে যেতাম।

ডায়রিতে টুলটুলের চেয়ে তৃপ্তির কথাই বেশি। কারণ, টুলটুলকে চিঠিতেই সব কিছু লিখতাম, তাই আর ডায়রিতে বিশেষ লেখার দরকার ছিল না। কিন্তু তৃপ্তির কথাই অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, তৃপ্তির কাছেই আমি প্রথম শারীরিক রোমাঞ্চের স্বাদ পাই। অথচ, কি আশ্চর্য, তৃপ্তির কথা, আমি পরবর্তী বছরগুলোতে একেবারেই ভুলে গেছি। এখন তৃপ্তির মুখখানাও আমার মনে পড়ে না।

আমি কলেজে ভর্তি হবার পর, তৃপ্তির সঙ্গে আর বিশেষ দেখাই হত না। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। ঝগড়ার কারণ অবশ্য আমি ছিলাম না, বড়দের ঝগড়া-তারপর থেকে দুই পরিবারে বাক্যালাপ এবং মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। তৃপ্তিও আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিত। এর কিছু দিন বাদেই তৃপ্তির বিয়ে হয়ে যায়।

জুলাই মাসের সাত তারিখে লেখা আছে, 'আজ মিছিলে গিয়েছিলাম। কি করে যে প্রাণে বাঁচলাম.....

স্বাধীনতার পরের কয়েকটি বছর মিছিল আর স্ট্রাইক লেগেই ছিল। আমিও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মহাউৎসাহে সেই সব মিটিংয়ে যোগ দিতাম। রশিদ আলী দিবস উপলক্ষে না কি যে উপলক্ষে আমরা সেদিন জমায়েত হয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। ছাত্ররা সেদিন ক্ষেপে উঠেছে, তিনখানা ট্রাম-বাস পুড়েছে। আমি ট্রাম-বাস পোড়াবার দলে ছিলাম না বটে, দূর থেকে দেখে উত্তেজিত বোধ করছিলাম। পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও পরে গুলি চালাতে শুরু করে। আমি আর রবি দাঁড়িয়েছিলাম পুরনো সিনেট হাউসের একপাশে। হঠাৎ একটা গুলি ঠিক আমার পাশেই এসে দরজায় বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। প্রথমে মনে হয়েছিল, গুলিটা আমার গায়েই লেগেছে। এত কাছে।

তারপর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছি। কিসে একবার গুঁতো খেয়ে আছড়ে পড়েছিলাম। ওয়েলিংটন পর্যন্ত পুলিশে তাড়া করে এসেছিল, আমি ক্রিক রো-র মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে একজন বুড়োমতন লোককে বলেছিলাম, বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জানতে পেরেছিলাম, আমার পা ভেঙ্গে গেছে। সেই ভাঙা পা নিয়েই এতটা রাস্তা ছুটে এসেছি। বুড়ো ভদ্রলোকটি খুব সহৃদয় ছিলেন, রাত্রিরের দিকে তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যান।

সেবার টুলটুল আমাকে লিখেছিল, সব কাজে সবার জন্য নয়। সবাই মিছিলে গেলে দেশ চলবে কি করে? তুমি কবি, তোমার অন্য কোন কাজ আছে, তোমার কাজ মিছিলে গিয়ে পা ভাঙা নয়। ঐটুকু বয়েসেই টুলটুলের কি গম্ভীর গম্ভীর কথা!

এর পরেও আরও কয়েকবার মিছিলে গেছি। তবে, আস্তে আস্তে আমার উৎসাহ কমে যায়।

টুলটুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত ধরনের। টুলটুল আমাকে চিঠি লিখত, চিঠিতে কত সব মনের কথা বলত– কিন্তু বেড়াতে যেত বিকুদার সঙ্গে। বিকুদা ওর

মামাতো ভায়ের বন্ধু। খুব সুন্দর চেহারা ছিল বিকুদার। আমি এ জন্য মনে মনে হিংসে বোধ করতাম, কিন্তু কোনদিন মুখে কিছু বলিনি।

টুলটুল কলেজে ভর্তি হবার পর ওর আর এক বন্ধু হয়, সুজিত। একবার টুলটুললরা দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিল, সেইখানে আলাপ হয় সুজিতের সঙ্গে। তারপর থেকে সুজিত ওদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসত। বেশ শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ধরনের ছেলে, ওর গানের গলা ছিল খুব ভাল। সুজিত এসে গান গাইত একটার পর একটা- টুলটুলদের বাড়িতে সবাই ভির করে শুন্‌ত, খুব তারিফ করত। আমি আস্তে আস্তে উঠে চলে আসতাম সেখান থেকে। আমার অভিমান হত খুব সেই বয়েসের অভিমান খুব তীব্র। আমি গান গাইতে পারতাম না, লোককে দেখাবার মতন কোন গুণই ছিল না আমার। শুধু কবিতা লিখতাম- তা তো লোকের কাছে থেকে লুকিয়ে রাখবার মতনই জিনিস। টুলটুল ছাড়া আর কেউ খবর রাখত না আমার সেই সব কবিতার।

টুলটুল অনেক চিঠিতে বিকুদা কিংবা সুজিতের কথাও লিখত ছেলেমানুষী সরলতার সঙ্গে। কিন্তু ও যে আমাকে ভালবাসে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। আমাদের দু'জনের ঝগড়া হত, মান-অভিমান হত- কিন্তু সারা জীবনে কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারব না- এরকম একটা অঙ্গীকারও হয়ে গিয়েছিল দুজনের মনে মনে।

'টুলটুলের সঙ্গে আমিও আজ ইডেন গার্ডেনসের মেলায় বেরিয়েছি।'

হ্যাঁ, মনে আছে, সেই একদিনই টুলটুলের সঙ্গে আমার একলা একলা বেড়ানো। ইডেন গার্ডেনসে সেবার একটা বিরাট মেলা হয়েছিল-সেরকম মেলা কলকাতায় আর কখনো হয়নি। গোটা ইডেন গার্ডেনস জুড়ে মেলা বসেছিল, চলেও ছিল অনেকদিন। জলের মধ্যে একটা খাবারের দোকান ছিল, সেটার নাম ছিল স্বপনপুরী, সেটা আবার ঘুরত আস্তে আস্তে। একটা এরোপ্লেন ছিল টেলিভিশন ছিল, রাণাপ্রতাপের বর্ম আর বর্শা, আরও কত রকম প্রদর্শনী, কত দোকান। একদিনে দেখে শেষ হয় না-কিংবা সেই বয়সে আমাদের সেই রকমই মনে হয়েছিল।

ম্যালেরিয়া থেকে সেরে উঠে আমি একলা একলাই একদিন গিয়েছিলাম সেই মেলায়। কেন না, আর দু'দিন বাদেই মেলা বন্ধ হয়ে যাবে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় টুলটুলকে দেখতে পেলাম। ওর চোখ-মুখ খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত। সেদিনও গোলাপী রংঙের ফ্রকটা পরে ছিল। ও আমাকে প্রথমে দেখতে পায় নি।

আমি ওর সামনে গিয়ে বললাম, এই, তুমি এখানে একলা একলা কি করছ? ও আমাকে দেখে চমকে গেল, আশ্বস্তও হল। ব্যস্তভাবে বলল, মামাবাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে এসেছিলাম। কোথায় গেল, খুঁজে পাচ্ছি না।

-কোথায় ছিল ওরা?

-ছবির একজিবিশানেই তো ছিল, এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

-চল, আর একবার খুঁজে দেখি।

দুজনে মিলে সারা মেলাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম। কোথাও ওদের পাওয়া গেল না। অবশ্য মেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে সেদিন ছিল অসম্ভব ভিড়। চতুর্দিকে ঠেলাঠেলি আর চাপাচাপি। তার মধ্যে টুলটুলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে ঘুরছিলাম আমি

মামাবাড়ির লোকদের খুঁজে না পেয়ে টুলটুলের মুখ শুকিয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, এখন কি হবে?

আমি বললাম, কেন, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

-কিন্তু ওঁরা কি আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবেন? তা কখনো হয়?

-আমরা তো সব জায়গায় খুঁজলাম, কোথাও তো পেলাম না।

-ওরাও আমাদের খুঁজছেন, আমরাও ওঁদের খুঁজছি, কেউ কারুর দেখা পাচ্ছি না।

-তাহলে আরও কিছুক্ষণ থাকি। ভিড় কমে গেলে যদি পাওয়া যায়।

-কত রাত্তির হয়ে যাবে!

- আমার সঙ্গে তো রয়েছ, তোমার ভয় কি?

টুলটুল আমার দিকে ওর বড় বড় চোখ দুটি মেলে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল,

আমি বুঝি ভয়ের কথা বলছি?

ঘুরে ঘুরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

জলের ধারে এসে বসে পড়লাম দুজনে। জলের ওপর কত রকম আলোর খেলা। কত রকম আওয়াজ। তার মধ্যে টুলটুলের ঘামে ভেজা হাতখানি মুঠো করে ধরে আমি চুপ করে বসে রইলাম।

একবারও ওর হাত ছাড়ি নি, পাছে টুলটুল আমার কাছ থেকেও হারিয়ে যায়। সেই প্রথম আমি বাড়ির বাইরে কোথাও টুলটুলের সঙ্গে পাশাপাশি বসেছিলাম।

টুলটুল আমাকে বলেছিল, নীলুদা, তুমি এতদিন অসুখে ভুগে খুব রোগা হয়ে গেছ।

–আবার দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবো।

–এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকলে তোমার আবার শরীর খারাপ হবে না?

–হয় হোক! তা বলে কি আমি তোমাকে ফেলে যাব নাকি?

–তুমি আমাকে কোনদিন ফেলে যাবে না?

–কোনদিন না।

–ঠিক? প্রতিজ্ঞা করছ?

–করছি!

এসব কোন প্রতিজ্ঞাই থাকে না। মাঝখানে কত বছর টুলটুলের সঙ্গে দেখা হয়নি। টুলটুল এখন একজন বিখ্যাত আর্টিষ্টের স্ত্রী। নিজেও নাম করা আর্টিষ্ট।

ডায়রিটার শেষ পাতায় লেখা আছে, 'একটি বছর পেরিয়ে গেল, আগামী কাল থেকে নতুন বছর। নতুন বছর থেকে আমি কি নতুন মানুষ হয়ে উঠব?'

এসব ছেলেমানুষী কথা। শুধু একটা বছর কেন, মাঝখানে কতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, আমি নতুন মানুষ হইনি, ক্রমশ পুরনো মানুষ হয়ে গেছি।

ডায়রিটা মুড়ে রেখে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ সেই কৈশোরে যৌবনের সন্ধিক্ষণের দিনগুলোয় ফিরে গিয়ে মনটা কি রকম অবশ হয়ে যায়। খানিকটা দুঃখ আর খানিকটা সুখ শরীরটাকে ঘিরে থাকে। যত দোষ-ত্রুটিই হয়ে থাক, সেই সব দিনগুলো আর ফিরে পাব না।

ডায়রির মধ্যে ঐ যে শুকনো মালাটা রয়েছে, কে ওটা দিয়েছিল? ডায়রিতে ওটার কোন উল্লেখ নেই। অথচ ওটা অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম কেন? চড়াৎ করে মনে পড়ে গেল। কোন একটা বিয়ে-বাড়ি থেকে টুলটুল আর ওর বাড়ির সবাই ফিরছিল সেদিন অনেক রাত্রে। সেদিন ওদের বাড়ির চাবি আমাদের বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। টুলটুল আর ওর ছোটবোন এসেছিল চাবিটা চাইতে। আমি তখনও জেগে ছিলাম, আমিই নিচে নেমে গেলাম চাবিটা নিয়ে। পান খেয়ে টুলটুলের ঠোঁট টুকটুকে লাল। হাতে একটা মালা। আমি চাবিটা দিতেই টুলটুল মালাটা আমাকে দিয়ে বলল, এই নাও, তোমার জন্য এনেছি। চাবির বদলে মালা।

সামান্য ঘটনা। সেদিন আর কি কি কথা হয়েছিল কিছু মনে নেই। কিন্তু মালাটা পেয়ে নিশ্চয়ই আমার অভূতপূর্ব আনন্দ হয়েছিল-নশ্বর ফুলের মালাটিকেও আমি চিরকালের জন্য রেখে দিতে চেয়েছিলাম।

শুকনো মালাটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখার চেষ্টা করলাম, সেই পুরনো কালের গন্ধ পাওয়া যায় কি না। গন্ধ নেই, স্মৃতি আছে।

হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় এল। ডায়রিতে আমার যে তিনজন প্রেমিকার কথা আছে, তাদের সঙ্গে এখন একবার দেখা করলে কেমন হয়? এদের কারুর সঙ্গেই বছরের পর বছর দেখা হয় নি।

তৃপ্তির সঙ্গে দেখা করার কোন উপায় নেই। বিয়ের পর থেকেই ও পাটনায় থাকে। কবে যেন ভাসা-ভাসা শুনেছিলাম, ওর পাঁচটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে। তৃপ্তিকে দেখলেও বোধহয় আমি চিনতে পারব না। যাই হোক, কলকাতায় থাকলে একবার না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত।

পূরবী কাকিমারাও অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন না। আমিও অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম না। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তবে শুনেছি, বসন্তকাকা রিটায়ার করে চেতলায়

বাড়ি করেছেন। ঠিকানা যোগাড় করা অসম্ভব নয়।

পূরবী কাকীমার আজও কোন ছেলেপুলে হয়নি। বাড়িতে তিনটে কুকুর পুষেছেন। কি একটা অদ্ভুত অসুখে ওর মাথার চুল উঠে গেছে অনেকখানি-কপালটা অস্বাভাবিক চওড়া মনে হয়। সেই রূপ ঝড়ে গেছে, চামড়ায় এখন কুঞ্চন। হয়তো পূরবী কাকিমা কোনদিনই দারুণ সুন্দরী ছিলেন না-আমার কল্পনার চোখই ওকে অত সুন্দরী করে তুলেছিল। তবে, এখনো দেখলে বোঝা যায়, এককালে মোটামুটি সুশ্রীই ছিলেন। মুখের হাসিটুকু ভারী মিষ্টি।

–কি রে, হঠাৎ পথ ভুলে এলি নাকি?

–না কাকিমা, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বিশেষ কাজে এসেছিলাম, ফেরার সময় ভাবলাম আপনার এখানে একটু চা খেয়ে যাই।

–কত বছর পরে তোকে দেখলাম বল তো?

আগে প্রত্যেক সপ্তাহে যেতাম পূরবী কাকিমার বাড়িতে, এখন কলকাতা শহরে থেকেও বছরের পর বছর দেখা হয় না। একটা কুকুরের বাচ্চা লাফিয়ে উঠল পূরবী কাকিমার কোলে। সেটাকে আদর করতে করতে বললেন, তোরা সব ভালটাল আছিস তো?

–হ্যাঁ। আপনি?

–আমার আর থাকা! অম্বলের অসুখটা যে কোথা থেকে এসে জুটল, কত ওষুধ খেলাম, কতজনে কত কথা বলে–

তারপর পূরবীকাকিমা বেশ কিছুক্ষণ ধরে অম্বলের অসুখের গল্প করলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা ওষুধের কথাও বললাম।

এক সময় পূরবী কাকিমার গায়ের গন্ধ পেলেই আমি রোমাঞ্চিত বোধ করতাম, এখন সে কথা ভাবলে হাসি পায়। পুরবীকাকিমার থেকেও আমি বোধহয় আরও বেশি বদলে গেছি।

কোন ক্রমে চা খেয়েই উঠে পড়লাম।

টুলটুলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সহজ উপায় নেই। টুলটুলের স্বামী আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কোন সভা-সমিতিতে দেখা হয়ে গেলে ভদ্রতার হাসি দেয় বটে-কিন্তু তার বাড়িতে আমার পক্ষে নিজে থেকে যাওয়া ভালো দেখায় না। টুলটুলও আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। তবে, কাগজে দেখেছি, দিন তিনেক বাদেই টুলটুলের ছবির একটা একজিবিশান হবে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। সেখানে তো আমি যেতে পারি, যে কোন দর্শকই যেতে পারে।

সেখানে গেলাম একদিন। কি ভেবে পকেটে করে নিয়ে গেলাম সেই শুকনো মালাটা। আমার মনে হয়, টুলটুল ছেলেবেলাতেই বেশি ভাল ছবি আঁকতো। এখন কার ছবিগুলোর মাথা-মুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না। অবশ্য আমি ছবির পেশাদার সমঝদারও নই। চোখে দেখে যে ছবি সুন্দর লাগে তার মর্ম বুঝতে পারি-কিন্তু মাথা খাটিয়ে ছবি বুঝতে পারি না।

দর্শকের সংখ্যা খুব বেশি নয়, তখন সদ্য বিকেল, টুলটুল উপস্থিত রয়েছে। তার স্বামী যে তখন সেখানে নেই, এতে আমি একটু স্বস্তি বোধ করলাম।

টুলটুল দুরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ওকে না ডেকে, নিজেই একখানা ক্যাটালগ কিনে ছবি দেখতে আরম্ভ করলাম। কয়েকটা মূর্তিও আছে।

প্রথম ছবিখানি একটি অরন্যের। গভীর সবুজ বন নয়, গাছগুলোর চেহারা ভয়ঙ্কর। শুকনো ডালপালা এঁকে-বেঁকে রয়েছে। টুলটুল এরকম অরণ্য দেখল কোথায়? নাকি ওর মনের মধ্যেই এরকম একটা অরণ্য আছে?

পরের ছবিটা গীর্জার। খুব পুরনো গীর্জা, তার ওপর বটগাছ গজিয়েছে.... এই সময় টুলটুল আমাকে দেখতে পেল। কাছে এগিয়ে এসে তীর্যক ভাবে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ এখানে?

আমি হেসে বললাম তুমি তো নেমন্তন্ন করনি। নিজে থেকেই এলাম।

–আমি কারুকেই নেমন্তন্ন করিনি।

–আমিও সাধারণ দর্শক হিসেবেই এসেছি।

–আমার সৌভাগ্য।

–টুলটুল কয়েকটা ছবি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে?

–ছবি কখনো বোঝানো যায় না।

–তবু, তুমি কি ভেবে এঁকেছ–সেইগুলো যদি বলতে। টুলটুল আমার চোখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, কি ব্যাপার বল তো? হঠাৎ এতদিন বাদে–

আমি তো হঠাৎ বলতে পারি না যে, বহুকাল আগেকার পুরোনো একটা ডায়রি পড়ে আমি ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। খুঁজে পেতে চাইছি সেই সব বয়সের টুলটুলকে। মাঝখানে অনেকগুলো বছর টুলটুল অনেক ভুল করেছে, আমিও অনেক ভুল করেছি। আমি টুলটুলকে বলেছিলাম, ওকে ফেলে কোনদিন চলে যাব না। আমি কথা রাখিনি। টুলটুলও আমার জন্য বসে থাকে নি।

ওকে শুধু বললাম, কিছুই ব্যাপার নয়। এমনিই তোমার ছবি দেখতে এলাম।

দ্যাখ। আমি আজ একটু ব্যস্ত।

ওপাশ থেকে কেউ একজন টুলটুলকে ডাকল। টুলটুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কেমন লাগে, ঐ খাতাটায় লিখে যেও।

–তুমি আত্ম প্রতিকৃতি আঁকো নি?

টুলটুল অবাক হয়ে বলল না। কেন?

এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। অনেক শিল্পীই তো আঁকে।

–আমার এখনও সে সময় হয়নি।

আর কোন কথা না বলে টুলটুল চলে গেল। আর একবারও তাকাল না আমার দিকে। আমিও কিছুক্ষণ রইলাম সেখানে। ঘুরতে ঘুরতে এলাম একটা মূর্তির কাছে।

একটি এবড়ো-খেবড়ো পাথরের তৈরি বালিকার মুখ। এটা টুলটুলের আত্ম-প্রতিকৃতি নয়-কিন্তু টুলটুল যখন এই বয়েসী মেয়ে ছিল, তখনই আমি ওকে ভাল চিনতাম।

পকেট থেকে সেই শুকনো মালাটা বার করে পরিয়ে দিলাম সেই মূর্তিটার গলায়। টুলটুল এটা দেখে চিনতে পারবে কিনা জানি না। হয়তো ওর কিছুই মনে পড়বে না। কিন্তু আমার তো ফেরত দেওয়া হয়ে গেল!

সোনার গয়না

বিয়েবাড়িতে এসে ভিড়ের মধ্যে কে কি রকম পোশাক পরে, তা আমার নজরে আসে না। মেয়েরা কিন্তু সবাই লক্ষ্য করে। সাড়ে সাতশো জন নিমন্ত্রিত পুরুষ আটশো জন মহিলাকে বাড়ির মেয়েরা পোশাক দিয়ে ঠিক চিনে রাখে।

আমার মাসতুতো বোন খুকু-তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে সামনে পেয়েই বললে, এই ছোড়দা, একটা হলদে কালো চেক চেক শার্ট পরা ছেলেকে দেখেছিস?

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, না তো?

দেকিসনি? তোর সামনে দিয়েই তো এইমাত্র গেল!

তখন আমার মনে হল, হলদে-কালো চেক চেক শার্ট পরা তিনচারজন ছেলেকেই বোধহয় আমি দেখেছি। কিংবা তারও বেশি হতে পারে! কিন্তু কোথায় দেখেছি, তা তো মনে নেই?

খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি হয়েছে?

খুকু দারুণ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বলল, নতুন বৌয়ের একটা টিকলি হারিয়ে গেছে। হলদে কালো শার্ট পরা একটা অচেনা ছেলে ওখানে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছিল।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মাসতুতো ভাই দীপঙ্করের আজই বৌভাত। সুতরাং আত্মীয় হিসেবে আমার অনেক কাজকর্ম করার কথা। কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না বলে আমি শুধু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ব্যস্ততার ভান করছিলুম। কিন্তু ওর একটা কাজে খুব উৎসাহ দেখানো যেতে পারে। শখের গোয়েন্দাগিরিতে কার না উৎসাহ থাকে। বললাম, চল তো গিয়ে দেখি।

ঠিক হলদে-কালো না হলেও, হলদে খয়েরি রঙের একটা চেক শার্ট আমারও আছে। ভাগ্যিস সেটা আমি আজ পরে আসিনি। আমার আপন মাসতুতো ভাইয়ের বিয়ে, সুতরাং

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আজ ধুতি পাঞ্জাবী পরতে হয়েছে।

খুকুর বুদ্ধি আছে, ঘটনাকে সে বেশি লোককে জানাল না। বিয়ে বাড়ির আনন্দ উৎসবের মধ্যে একটা চোর ধরার হুজুগ তোলা ঠিক নয়। চুপি চুপি কয়েকজনকে জানাল। গেটের কাছে দুজনকে নজর রাখতে বলল।

আমি ওপরে ওঠে এলাম।

দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটিতে নতুন কনেকে বসানো হয়েছে। তাকে ঘিরে যথারীতি মেয়েদের ভিড়।

কনেকে এই প্রথম আমি ভাল করে দেখলাম। আজ বৌভাত। বিয়ের দিনও আমি ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেদিন ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে বৌকে ভাল দেখতে পাইনি।

বিয়ের দিন মোটামুটি চেহারার সব মেয়েকেই বেশি সুন্দরী দেখায়-একে আরো জমকালো দেখাচ্ছিল। লাল রঙের বেনারসীটাতে আবার নানারকম জরির কাজ, কোমরের ওপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গয়নায় একেবারে মোড়া। মুখে কত রকম যে রং মাখানো হয়েছে তার ঠিক নেই, দারুন গরমের মধ্যে মেয়েটি বসে বসে ঘামছিল, মুখে অবশ্য হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। বিয়ে কিংবা বৌভাতের দিন কনে বউয়ের কোন ব্যক্তিত্ব থাকতে নেই, কারুর সঙ্গে জোরে কথা বলতে নেই। শুধু মিষ্টি হেসে নমস্কার করাই তার একমাত্র কাজ। আমি বললুম, ঐ তো মাথায় টিকলি রয়েছে!

খুকু আমাকে চোখ দিয়ে ধমক লাগাল।

আমি নির্বোধ। টিকলি বুঝি একটার বেশি দুটো থাকতে নেই? যার এগারো জোড়া দুল, চারখানা হার, তিনজোড়া বালা, আঠারো গাছা চুড়ি, তেইশটা আংটি, তারপরেও বাজু, আমলেট-টামলেট আরও কি, তার তো তিনটে টিকলি থাকবেই।

দীপঙ্কর জার্মানি থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে তো, তাই তার বাজার দর ভাল। শুনেছি, এগারোটা পাত্রী দেখার পর এই মেয়েকে বাছা হয়েছে। আমার মাসীরা প্রগতিশীল। বিয়েতে পণ দেননি, তবে চল্লিশ না পঞ্চাশ ভরি সোনা, জাপানী ঘড়ি, রেফ্রিজারেটার, আশীখানা প্রণামী, বরযাত্রীদের বাস ভাড়া এসব না নিলে এ-রকম পাত্রের মান থাকে কি করে? গরদের পাঞ্জাবী পরে দীপঙ্কর নিচে তার বন্ধুদের তদারক করছে, মুখখানা রীতিমত খুশি খুশি। বিয়ের তত্ত্ব ছাড়া নিমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপহারও এসেছে অনেক। শাড়ি গয়নার বাক্স ডাঁই করে রাখা।

আমি ভাবলুম, এত গয়নার মধ্যে একটা টিকলি আছে কি নেই, তা জানা গেল কি করে? সব সময়ই কি একজন কেউ গুণে দেখছে?

না, ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। সেই টিকলিটা দিয়েছেন নতুন বৌয়ের বড় বৌদি। তিনি তাঁর নিজের জিনিসে খেয়াল রাখবেন না! তিনি একনজর দেখেই বুঝেছেন, তাঁর টিকলিটা নেই। শুভদিনে তাঁর আশীর্বাদী জিনিসটা হারিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায় কথা। বড় বৌদি এমনিতেই নাকি রাগী, তিনি আবার বলেছেন তাঁর শরীর ভাল নেই বলে এ বাড়িতে কিছু খাবেন না। কুটুম বাড়ির লোকদের কাছে এ বাড়ির লোকদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এ বাড়িতে তো মেয়েদেরই ভিড়, পুরুষরা দরজার কাছে থেকে উঁকি মেরেই চলে যায়। কেউ বা উপহারের প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে দিয়েই কেটে পড়ে। এর মধ্যে চেক শার্ট পরা এক একটা ছেলে কনে বউয়ের কাছাকাছি গেল কি করে? যে করেই হোক গিয়েছিল ঠিকই। এরা ভেবেছে কুটুম বাড়ির কেউ, ওরা ভেবেছে এ বাড়ির কেউ। এখানে তো পুরুষের সঙ্গে চেনা হওয়া হয়নি। দীপঙ্কর বাকি কনের ছোট ভাইকে ও কয়েকজন চেনা প্রণাম করে গেলেছে।

আমার মনে হল, সামান্য একটা সোনার জিনিস চুরি গেছে, এই নিয়ে এখন হৈচৈ না করাই ভাল। পরে ভাল করে খুঁজে দেখলেই হবে। নতুন বৌয়ের মুখ দেখে মনে হয়, সে বোধহয় এখন কোন গোলমাল চায় না।

কিন্তু, তার মুখ দেখে যদি আমি বুঝতে ভুল করি, তিনটে টিকলি না থাকলে তার জীবনটা সত্যি ব্যর্থ হয়ে যাবে, তা বলে দীপঙ্কর কি তাকে আর একটা টিকলি কিনে দিতে

পারবে না? তার জন্য ফুলশয্যার রাতটাকে বিষণ্ন করার কোন মানে হয় না।

আমি খুকুকে বললাম, এখন আর সে ছেলেটাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সে-ই যে নিয়েছে তার কি কোন মানে আছে?

খুকু বলল, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মাঝখানে এসেছিল আর একটা পাখা লাগাতে। তার গায়ে আবার কি রঙের শার্ট ছিল?

মোটা লাল রঙের গেঞ্জি।

আর প্যান্টটা? খাকি?

ছোড়দা, তুমি ইয়ার্কি করছ?

এখন চেপে যা। এখন এই গয়না চুরি নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলার কোন মানে হয় না। তাতে অন্য নিমন্ত্রিতরা অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু আমার উপদেশ গ্রাহ্য করতে কারুর বয়েই গেছে। আমি তো একটা অকর্মার ঢেঁকি ছাড়া আর কিছুই না।

অবিলম্বে মেসোমশাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

তারপর মামা মাসী পিসে খুড়োর দল বিশেষত সর্বঘটে কাঁঠালি কলা আমার মেজকাকা এসে নানারকম জেরা শুরু করলেন। গয়নার স্তূপ ঠিকঠাক সাজিয়ে গোনাগুনি শুরু হয়ে গেল। অন্য মহিলারা আড়ষ্ট হর্ম্রে বসে রইলেন, দু-একজন উঠে গেলেন ঘর থেকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল, একজন প্রবীণ গোঁপওয়ালা লোককে সারা বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, অথচ তাকে কেউ চেনে না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী যে চারজন রয়েছে তাদের মধ্যে একজনও লাল গেঞ্জি পরা নয়। তাহলে সেই মোটা লাল রঙের গেঞ্জি পরা লোকটা কে? একজন রোগা মতন মহিলা নতুন বউয়ের কাছ ঘেঁষে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন, তিনিই বা হঠাৎ কোথায় গেলেন?

হলদে কালো চেক শার্ট সম্পর্কেও নানারকম মতোভেদ দেখা গেল। কেউ বলল, হলদে- কালো চেক তো নয়, গোলাপি-কালো চেক। আবার আরেকজন বলল, হলদে-কালো বা গোলাপি-কালোর মতন ক্যাটকেটে জামা আজকাল কেউ পরে না, ওটা ছিল কচি কলাপাতা রঙের আপেল রঙের ট্রাইপ।

চুরির কথাটা আস্তে আস্তে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। থার্ড ব্যাচে যারা খেতে বসেছিলেন, তারা চাটনি পরিবেশনের সময় এই খবরটা শুনে এমন আলোচনায় মেতে গেলেন যে খাওয়া শেষ করতে দেরি করে ফেললেন অনেক। বিশ্ব সমস্যার চেয়ে সামান্য একটা সোনার গয়না চুরির গল্প অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

তবু একথা ঠিক, দীপঙ্করের বৌভাতের উৎসব একটু ম্লান হয়ে গেল। অনেকেই নানারকম কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

একটা অসৌজন্যের ব্যাপার আমার মাসী-মেসোমশাইদের মনে পড়েনি। এত লোকজনের মধ্যে হঠাৎ একটা চুরির কাহিনী ছড়িয়ে দিলে কারুর কারুর মনে খুব অস্বস্তি জাগে। এ ধরনের মানুষ আছে, যারা যে কোন গোলমালের সময়ই নিজেকে দায়ী করে, আমাকে চোর ভাবছে না তো? এর সঙ্গে গরীব বড়লোকের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক বিখ্যাত লোককেও আমি দেশলাই চুরি করতে দেখেছি। খুব ধনী লোকেরাও ক্রিপটো-ম্যানিয়াক হয়। সকলেই অভাবে চুরি করে না, স্বভাবেও কেউ কেউ চোর হয়।

অযত্নে পড়ে থাকা গয়না অন্য কারুর চোখে পড়লে সে তক্ষুণি সেটা ফেরৎ দিতেও পারে, আবার ভাবতে পারে, লুকিয়ে রেখে ওদের আর একটু চিন্তিত করি। সেই রকম কেউ লুকিয়ে রাখেনি তো! সকলকেই যে চিন্তিত করে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই গয়না আর পাওয়া গেল না।

আজকাল বিয়ে বাড়িগুলো সব প্রায় একই রকম হয়। বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। দীপঙ্করের বিয়েতে ঐ একটা গয়না চুরির ব্যাপারে বৈচিত্র্য হয়ে গেল। এরপর কয়েকদিন দীপঙ্করের স্ত্রী স্বস্তির নানা রকম প্রশংসা শুনতে লাগলুম। এমন রূপসী মেয়ে কিন্তু একটুও অহংকার নেই। ওর ম্যাথমেটিক্স নিয়ে এম এ পাস, অথচ কথা শুনে কে বুঝবে যে অত

বিদুষী মেয়ে। যেমন নম্র, তেমন হাসি খুশি, শ্বশুর শাশুড়িকে যা ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাতে আজকাল বউদের আদর্শ স্থানীয় হতে পারে। শুধু একটি ব্যাপারে সে একটু রহস্যময়ী।

গয়না চুরির প্রসঙ্গটা চাপা পড়েনি। আজকাল এসব ব্যাপারে কেউ পুলিশে খবর দেয় না। তবু জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। এই রকম জল্পনা কল্পনার সময় নতুন বউ হঠাৎ মন্তব্য করেছে, কে নিয়েছে আমি জানি। ও কথা থাক। তখন সকলে মিলে তাকে অনেক পিড়াপিড়ি করলেও সে আর নাম বলেনি।

বার বার বলেছে, ও কথা থাক।

তাতে ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নেয়। এ কথার একমাত্র মানে হয় বাইরের কোন উটকো লোক এসে চুরি করে নিয়ে যায়নি। চেনাশুনা কেউই। এরকম কথা শুনলেই গা শিরশির করে।

চেনাশুনা সব লোকের চরিত্র আজ নতুন ভাবে উদ্ভাসিত হয়। শুধু যে জিনিসটার দামের লোভেই কেউ নিয়েছে, তা না-ও হতে পারে। হয়তো জব্দ করার জন্য, কুটুম্বদের কাছে মুখ ছোট করার জন্য। বেছে বেছে সেইজন্য বউয়ের রাগী বড় বৌদির জিনিসটাই নিয়েছে। বড় বৌদি সেদিন কোন খাবার মুখে না দিয়ে কি অপমানটাই না করে গেলেন।

আত্মীয় স্বজন অনেকের সম্বন্ধেই কানাকানি শুরু হয়ে যায়। দেখা যায়, জব্দ করার জন্য কিংবা অপমান করার জন্য অনেকেই নাকি মুখিয়ে আছে। অমুক কি রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু ভেতরে যে কি বিষ আছে তা আর বুঝতে বাকি নেই। অমুক কাকীমা কি রকম শুনিয়ে গেলেন যে, তাঁর এক বোনপোর বিয়েতে এর ডবল জাঁকজমক হয়েছিল।

আমার মাসতুতো ভাই বোনদের এক বিধবা পিসীমা বহুদিন ধরে ও বাড়িতে আছেন। সকলে তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ ছিল এতদিন। ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের তিনি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, সকলকে মায়ের চেয়েও বেশি যত্ন করেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি ঘরে ঢুকে পড়লে সবাই কথাবার্তা থামিয়ে দেয়। অনেকেই এখন লক্ষ্য করে ওঁর ব্যবহারটা যেন ইদানীং কেমন কেমন। ওঁর একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখানো যায়নি, এখন কোনক্রমে একটা ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছেলের ওপর ওঁর বড্ড বেশি বেশি টান। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেকে বেশি খাবার দেন। ছেলের মা হাতখরচের বহর! সেই খরচ জোগাতে পিসীমা কি করে ফেলেছেন তার ঠিক কি! বয়েস বেশি হলে অনেকের মাথা ঠিক থাকে না।

পিসীমা বুদ্ধিমতী। দু'দিনেই বুঝে গেলেন অন্যদের মনোভাব। একদিন সন্ধ্যেবেলা নতুন বৌয়ের ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ গো নতুন বৌ, আমি তোমার টিকলি নিয়েছি? তুমি বলেছ, তুমি জানো কে নিয়েছে। তাহলে আমার মুখের ওপর বল! একথা যদি সত্যি হয়, আমি ঠিক গিয়ে মরব! এতকাল এদের দেখলুম–

নতুন বউ খাট থেকে নেমে এসে পিসীমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলল, দিদি, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

নতুন বউ খুবই নম্রতার সঙ্গে পিসীমাকে বোঝাল যে পিসীমার কথা সে ঘুণক্ষরেও চিন্তা করেনি।

পিসীমা একটু শান্ত হলেন। চোখের জল মুছে বললেন, তাহলে তুমি ঠাকুরের নামে দিব্যি গেলে বল।

নতুন বউ বলল, আমি যে-কোন দিব্যি গেলে বলছি। আমি তো আপনার কথা ভাবিইনি। অন্য কেউই আপনার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারে না। আপনি ভুল শুনেছেন।

তাহলে কে নিয়েছে?

সেটা আমি বলতে পারব না।

একজন সন্দেহ-মুক্ত হলো। পিসীমা হঠাৎ বেশি বেশি খুশি হয়ে তাঁর যৌবনকালের গল্প বলতে লাগলেন।

এরপর আর একটা আলোচ্য বিষয় এল। কে নেয়নি, নতুন বউ সে কথা বলতে রাজি আছে। তাহলে চেনাশুনাদের মধ্যে কে কে নেয়নি, তা বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, তা হলে বল, আমি কি নিয়েছি তোমার

টিকলিটা?

তার বৌদিও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এ কি ভাই! তোমরা কি এখানে কোর্ট বসাবে নাকি? একটা সামান্য জিনিস, ছেড়ে দাও না!

বিয়ের পর আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি এক একদিন নেমন্তন্ন খাওয়াই রেওয়াজ। সেই অনুসারে দপিঙ্কর আর ওর স্ত্রী স্বস্তিও একদিন আমাদের বাড়িতে এল, আমি অসামাজিক জীব, রাত এগারোটার আগে কোনদিন বাড়ি ফিরি না। আমার বাড়িতে কেউ এলে আমার সঙ্গে দেখাই হয় না। তবে কিনা দীপঙ্কর জার্মানি যাবার আগে পর্যন্ত আমার খুবই ভক্ত ছিল, তাই সেদিন আমি সন্ধ্যেবেলা বাড়িতেই রইলাম।

দীপঙ্কর শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া সুট, জুতো, ঘরি পরে (মোজা আর রুমাল ও বাড়ির বোধ হয়) একেবারে শ্বশুরবাড়ির ছেলে সেজে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ির মেয়েকে। ওকে আর চেনাই যায় না।

স্বস্তি ভেতরে গেলে, আমি দীপঙ্করকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলাম। দু-চারটা টুকিটাকি কথার পর জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, সিগারেট খাস না?

লাজুক মুখ করে ও বলল, তোমার সামনে খাব ছোড়দা?

পাঁচ বছর জার্মানিতে থেকেও ও এখানে আমার মতন সামান্য গুরুজনের সামনে সিগারেট ধরায় না। সম্বন্ধ করা বিয়ে করে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কির সুরে কথা বলে না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঠিকঠাক নেমন্তন্ন রাখতে যায়। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে। রীতিমত ভাল ছেলে যাকে বলে।

আর আমরা বিলেত জার্মানি কোথাও যাইনি, তবু গুরুজন-ফুরুজনকে অযথা ভক্তি করি না, বাড়ি ফেরার ঠিক নেই, বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবলেই ঘেন্না হয়, এ রকম আরও কত কি। বিলেত জার্মানির থেকেও আমরা অনেক বেশি আধুনিক।

দীপঙ্কর পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করল এবং সুদৃশ্য লাইটার। অর্থাৎ অ্যামেচার।

সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটান দেবার পর লক্ষ্য করলাম, ওর সঙ্গে আমার গল্প করার মতন কোন বিষয়ই নেই। অথচ আগে দেখা হলে কত বকবক করতাম। ওর পাঁচ বছর প্রবাসের ফলে বোধহয় দীপঙ্করই অনেক বদলে গেছে, কিংবা আমিই বদলে গেছি।

সুতরাং কিছু একটা বলতে হবেই, এই জন্য বললাম, হ্যাঁ রে, তোদের বিয়ের সময় সেই সোনার গয়না চুরির ব্যাপারটা কি হল রে?

দীপঙ্কর বলল, সেটা আর পাওয়া যায়নি।

জিনিসটা দামী ছিল?

পাঁচ-ছশো টাকা দাম হবে।

কথার ভঙ্গি শুনে বুঝতে পারলাম, দীপঙ্কর পাঁচ-ছশো টাকাকে বেশ মূল্য দেয়। পাঁচ-ছশো টাকা হাতের মুঠোয় এক্ষুণি থাকলে তার একটা মূল্য আছে, কিন্তু যে টাকা হাতে নেই, তার আবার মূল্য কি!

শুনেছিলুম যেন তোর বউ জানে যে কে নিয়েছে?

হুঁ?

কে নিয়েছে?

আমি তো জানি না।

তোকেও বলেনি?

না।

সে কি, নতু বউরা স্বামীকে ওসব কথা বলে না নাকি?

বিয়ে তো করলে না, বুঝবে কি করে এসব?

সুযোগ পেয়েই দীপঙ্কর একটা বিজ্ঞের হাসি দিল। এই সব প্রসঙ্গে এলেই বিবাহিত লোকেরা অবিবাহিত লোকদের এক হাত দেয়। যেন বিয়ে করে একটা মস্ত বড় কাজ করেছে। তাও তো নিজে করতে পারিস নে, বাপ মা হাত ধরে বিয়ে দিয়েছে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করব।

না ছোড়দা, তার দরকার নেই। সবাই ওকে এ কথা জজ্ঞেস করে বলে, ও আজকাল এতে বিরক্ত হয়।

ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক সন্দেহ নেই। আমি গল্প-টল্প লিখি বলে আমার কৌতূহলটা আরও বেশি হবে।

খাবার টেবিলে স্বস্তির সঙ্গে আমার প্রথম ভাল করে আলাপ হল। মেয়েটি নম্র হলেও সপ্রতিভ। কথাবার্তা বেশ তাল বলতে পারে। অনাবশ্যক জড়তা নেই। মেয়েদের আলাদা পরিবেশে কি রকম আলাদা মনে হয়। কনে বউ হিসেবে যে জড়ভরত জাতীয় মেয়েটিকে দেখেছিলাম, আজ সে অন্য রকম। দীপঙ্করের মুখে কিন্তু সেদিনের মতন আজও একটা গদগদ ভাব।

নতুন বউ হয়েও স্বস্তি আবার পরিবেশনে মা ও বৌদিকে সাহায্য করল। নিয়ম মেনে প্রশংসা করল প্রত্যেকটি রান্নার। তার ব্যবহার সে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল একেবারে।

স্বস্তি আজও অনেক গয়না পরে এসেছে। নতুন বউদের মাথায় বেশি সিঁদুর এবং গায়ে বেশি গয়না রাখতেই হয় বোধহয়। মা এবং বৌদি তার গয়নার ডিজাইনগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করতে লাগলেন, তখন সেও বেশ উৎসাহের সঙ্গে দেখতে লাগল পিওর ম্যাথমে-টিক্সে এম-এ পাস হওয়া সত্ত্বেও সে গয়না বেশ ভালবাসে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভাগ্যিস সে কোন বাকসর্বস্ব ছাত্র নেতা কিংবা ভ্যাগাবন্ড সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রেম করে বসেনি, তা হলে এত গয়না পরতে পারত না। কিংবা দু-একটা ছুটকো-ছাটকা প্রেম করেছে বোধ হয়, কিন্তু বিয়ে করবে বাবা মায়ের দেখে দেওয়া পাত্রকে; এটা আগেই ঠিক ছিল। আজকাল তো এইটাই কায়দা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অনেক গয়না পরলেও মাথায় টিকলি তো পরেনি স্বস্তি! তার পরই মনে পড়ল বিয়ের দিন ছাড়া অন্য কোন সময় কি বাঙ্গালী মেয়েরা টিকলি পরে? কদাচিৎ এমন দেখেছি বোধহয়। তা হলে তিনটে টিকলি দিয়ে কি হয়। কি আর হবে, ওগুলো পরে গলিয়ে অন্য গয়না বানানো হবে। যদি অন্য গয়না সব থাকে? তাহলে ও আরো গয়না হবে নইলে এতরকম ডিজাইন বেরিয়েছে কেন? তাছাড়া গয়নাই তো মেয়েদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

খাওয়া দাওয়া এবং গল্প সারার পর ওরা বাড়ি যাবে, আমি নিচে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে এলাম। সেখানে গাড়ি আছে ড্রাইভার নেই। ড্রাইভারটা কোথায় গেছে আড্ডা মারতে। দীপঙ্কর নিজে গাড়ী চালাতে জানে বটে, কিন্তু অফিস থেকেই তাকে গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়েছে বলে নিজে চালায় না।

ড্রাইভারের অপেক্ষায় আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। ওরা শিগগিরই বেড়াতে যাচ্ছে কাশ্মীরে, আমি কাশ্মীর সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান দিলুম। তারপর হল সদ্য দেখা সিনেমার গল্প। তারপর দীপঙ্করের নিষেধ সত্ত্বেও আমি ফস করে জিজ্ঞেস করলাম স্বস্তিকে, তোমার সেই গয়নাটা কি হল?

স্বস্তি একটু থেমে বলল, ওটা আর পাওয়া যাবে না।

কে নিয়েছে, তুমি তো জানো?

তা জানি।

তাহলে তার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছ না কেন?

সেটা সম্ভব নয়। জিনিসটার ডিজাইনটা খুব সুন্দর ছিল, এইজন্যই আমার যা একটু দুঃখ হয়। যদি টাকা পয়সাও নিত–

এরপর একটা কথা আমার না বলেও চলত, তবু বলে ফেললাম, তুমি যখন কারুকে তার নাম বলবেই না, তখন এ কথাটাও তোমার বলা উচিৎ হয়নি যে তুমি জানো কে নিয়েছে।

স্বস্তি বলল, তা ঠিক, আমার বলা উচিত হয়নি। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম। একটু থেমেই সেমত পাল্টে ফেলল। সে বলল, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি একজনকে নিতে। ঐ কথা বলেছি, যাতে সে অন্তত বোঝে যে আমি ঠিকই টের পেয়েছি। আর কেউ না হয় না-ই জানল। ড্রাইভার এসে গেছে, সুতরাং এ আলোচনা আর বেশি দূর এগোল না।

এরপর কদিন ধরে আমি অনবরত ভাবতে লাগলাম, গয়নাটা কে নিতে পারে; ভেবে ভেবে কোন কুল কিনারাই পেলামনা। ডিটেকটিভ-সুলভ বুদ্ধি আমার একটুও নেই।

তারপর নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলুম। জীবনে কত কি ব্যাপার আছে, শুধু শুধু আমি পরের একটা গয়না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন! কিন্তু গয়না আমাকে পেয়ে বসল। রাস্তাঘাটে আগে মেয়েদের শুধু মুখ কিংবা উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতুম, এখন তাদের গয়নাও দেখি। কোন কোন মেয়ের গায়ে একটাও গয়না নেই, অনেকের আবার এক-গা গয়না। কারুকে একটি মাত্র গয়নাতেই বেশ ভাল দেখায়। গয়নায় কারুর কারুর রূপ খোলে, নিরাভরণ রূপসীও আছে। নাঃ এ ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে।

তবে, গয়না নিয়েই একটা মজার ব্যাপার হল। একদিন আমি নাইট শো-তে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। পায়ে কি যেন ঠেকল। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে মনে হল, একটা সোনার বালা। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটার ওপর পা চাপা দিলাম। তারপর অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়, এই ভাবে নিচু হয়ে সেটা নিয়েই ভরে ফেললাম পকেটে।

পরক্ষণেই মনে হল, আমি এ-রকম করলাম কেন? এ তো চোরের মতন ব্যবহার! অন্য কারুর একটা জিনিস এখানে পড়ে আছে, সেটা এ-রকম চুপি চুপি পকেটে ভরে ফেলার কি মানে হয়? আমি দেখছি নিজেকেও এখন চিনি না। আমার শরীরটা শিরশির করতে লাগল। বাকি সময়টা সিনেমাতে আর মন বসাতেই পারলাম না। তক্ষুণি ঠিক করে ফেললাম, এটা যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবি শেষ হবার পর প্রথমেই গেলাম বাথরুমে, পকেট থেকে জিনিসটা বার করে দেখলাম ভালভাবে। বেশ মোটা একটা মকরমুখো বালা, সোনার ভরি সম্পর্কে আমার কোন আন্দাজ নেই, তবে বেশ দামীই হবে মনে হয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের খোঁজ করলাম। সবাই তখন বন্ধ-টন্ধ করবার জন্য ব্যস্ত, সহজে কেউ কথার উত্তরই দিতে চায় না। তারপর জানা গেল, ম্যানেজার অনেক আগেই চলে গেছে।

যাকে তাকে তো এরকম একটা দামী জিনিস দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। তাই আমি বালাটা বাড়িতেই নিয়ে এলাম। খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ আবার সেটাকে দেখলাম নেড়েচেড়ে। জোরের জায়গাটা একটু ভাঙ্গা। সেই জন্যই বোধহয় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে। ইস, যার বালা তার এখন মনের কি অবস্থা! নারী হৃদয়ে সোনার কি স্থান, তা আমি এখন জেনেছি। বালাটার কথা বাড়িতে কারুকে বললাম না। কে কি রকম উপদেশ দেবে কে জানে! নিজের বুদ্ধি মতন চলাই ভাল। পরদিন বিকেলে আমি আবার গেলাম সেই সিনেমা হাউসে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বললাম।

ম্যানেজার লোকটা সুবিধের না। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। বালাটা হাতে নিয়ে একটা শিস দিয়ে বলল, ভরি দু-এক তো হবেই! আপনি এটা নিয়ে কি করতে চান?

যার জিনিস তাকে ফেরৎ দিতে চাই। যদি এখানে খোঁজ করে.....

ঠিক আছে রেখে যান।

এমনি এমনি ছাড়লাম না। ম্যানেজারের কাছ থেকে রসিদ লিখিয়ে নিলাম। বালাটির বর্ণনা দিয়ে তাতে লেখা থাকল যে সেটি উনি আমার কাছ থেকে জমা রাখছেন। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ ফেরৎ নিতে আসে, তাহলে তিনি তার কাছ থেকেও একটা রসিদ রাখবেন এবং আমাকে সেটা দেখাতে হবে। একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন।

তারপর আমার মাথায় ঘুরতে লাগল একটা অদ্ভুত চিন্তা। যার বালা, তাকে দেখতে কি রকম? তার কি নতুন বিয়ে হয়েছে? বালাটা হারাবার ফলে তার এখন মানসিক অবস্থা কি রকম? বালাটা ফিরে পেয়ে সেকি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাবে?

এইসব অলস চিন্তা আর কি? কোন মানেই হয় না।

এমন কি এই কথাও আমার মনে হল, ম্যানেজারটা আমাকে ঠকাবে না তো? সে যাতা কারুর নামে একটা রসিদ লিখিয়ে নিয়ে বালাটি মেরে দিতেই পারে! অত সহজে ওকে আমি ছাড়ছি না। সেই রসিদের ঠিকানা দেখে আমি বাড়িতে খোঁজ করব।

ধরা যাক, সে রকম একটা বাড়িতে আমি গেছি। কে দরজা খুলে দেবে? দরজা খোলার পর আমি যখন বলব.....

আবার অলস চিন্তা। পরদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলাম, কেউ বালাটার খোঁজ নিতে আসেনি। এই ব্যাপারটা আবার আমাকে ভাবিয়ে তুলল। একটা দামী বালা ফেলে গিয়েও খোঁজ করছে না? এতই বড়লোক? বড়লোক হলেও সোনা সম্পর্কে তো মায়া থাকে। হয়তো সিনেমা হলে ফেলে যাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। অন্য জায়গায় খুঁজে মরছে। কিংবা হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেছে? মহা মুশকিলের ব্যাপার তো। বালাটা এ সিনেমার ম্যানেজারকে হজম করতে দেওয়া যায় না। ওর কাছ থেকে ফেরৎ নিতে হবে। কিন্তু নিয়ে আমিই বা কি করব? মেয়েলি গয়না, পরের জিনিস, আমি কেন নেব? এসব জিনিস বোধহয় গভর্নমেন্টকে জমা দেওয়া উচিত। কিন্তু গভর্নমেন্ট মানেই তো একজন অফিসার, তাকে বিশ্বাস করা যায়!

পরপর তিনদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলাম, কেউ আসেনি নিতে। এই সময় একদিন রাস্তায় দীপঙ্কর আরস্বস্তির সঙ্গে দেখা। ওদের দেখেইআমার চট করে একটা কথা মনে পড়ল। বালাটা স্বস্তিকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? ওদের একটা জিনিস হারিয়েছে, আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি, সেটা ওদের পাওয়াই ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু এই প্রস্তাব কি দেওয়া চলে? ওরা অপমান বোধকরবে নাতো? কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা অনেকে ভিখিরিকে দান করে। কুড়িয়ে পাওয়া সোনার গয়না পেলে কি করতে হয়?

কথায় কথায় ওদের আমি ঘটনাটা বললাম। স্বস্তি মুখখানা করুণ করে বলল, ইস, যার হারিয়েছে তার কি অবস্থা! আর কেউ তার অবস্থা বুঝতে না পারুক, আমি ঠিক বুঝতে পারছি।

আমার এখন কি করা উচিত বল তো?

আপনার উচিত কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। সিনেমা ম্যানেজারকে ওটা দিলেন কেন?

ঠিক তো।

আপনি নিজের কাছে রাখুন।

সিনেমা ম্যানেজারকে ফোন করতেই তিনি বললেন, আপনি এক্ষুণি এখানে চলে আসুন।

আমি ভাবলাম, তাহলে বুঝি আসল মালিক এসেছে। তক্ষুণি ছুটলাম গিয়ে দেখলাম ঘর ফাঁকা, আর কেউ নেই।

ম্যানেজার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চান? রসিদটা এনেছেন?

কেন?

আপনি আমাকে একটা বাজে জিনিস দিয়ে একটা সোনার গয়নার রসিদ লিখিয়ে নিয়ে গেছেন? দিন, শিগগির রসিদটা ফেরৎ দিন।

বাজে জিনিস মানে?

আজ একটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওরা দেখেই বলল ঝুটো মাল। রোল্ড গোল্ড, সাত আট টাকার বেশি দাম হবে না। বাজে ক্লাসের মেয়েরা পরে, অনেক সময় সিনেমা অ্যাকট্রেসরাও–

ম্যানেজারের কাছে থেকে বালাটা নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। ম্যানেজার কেন ওটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা জিজ্ঞেস করিনি। সোনা ভেবে এই জিনিসটাকে নিয়ে আমিও তো কয়েকদিন সময় নষ্ট করেছি। জানি, দীপঙ্কর আর স্বস্তির সঙ্গে দেখা হলেই এ ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করবে। যেমন আমি ওদের সেই হারানো টিকলিটার কথা ভুলতে পারি না। সোনা কি না।

ঝুটা বালাটা আমি চাকার মত রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে দিলাম। আর কেউ পেয়ে মজা বুঝুক।

নাম ভূমিকায়

বিদেশ থেকে ফিরে, বিদেশের নানারকম অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কয়েকটা ছোট ছোট লেখা লিখেছিলাম। সেগুলিকে ঠিক ভ্রমণ কাহিনী বলা যায় না, আবার রম্যরচনাও নয়। যেভাবে মনে এসেছে, সেইভাবেই লিখেছি। যেমন, একটা লেখার নাম ছিল, যারা আর ফিরবে না। ইউরোপ আমেরিকায় এ রকম বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অনেকেরই দেখা হবে-যারা দু-এক বছরের জন্য ওদেশে গিয়েছিল। তারপর কোন কারণে সারা জীবন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অ্যারিজোনায় আমি এরকম একজন মানুষকে দেখেছি, যিনি তেতাল্লিশ বছর ধরে ওদেশে আছেন-এখনো ফিরে আসার কথা চিন্তা করেন না, কিন্তু বোঝাই যায়, ওর পক্ষে সব ছেড়েছুড়ে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। সেই রকমই নিউইয়র্কে দেখেছিলাম আমার বাল্যবন্ধু নবেন্দুকে, যে মাত্র চার বছর ওখানে রয়েছে, কিন্তু কোন কারণে স্বদেশের প্রতি এমন একটা তীব্র অভিমান জন্মে গেছে যে ও আমাকে বলেছিল, এখানে না খেয়ে মরতে হলেও মরব, কিন্তু দেশে ফিরে কারুর কাছে দয়া চাইব না। আর কোনদিন ওদিকে যাচ্ছি না। বেড়াতে হলে জাপানে বেড়াতে যাব। কিন্তু ইন্ডিয়ায় কক্ষনো না।

আমি নবেন্দুর এত অভিমানের ঠিক কারণ খুঁজে পাইনি, অথচ জানতাম,নবেন্দুর বাবা মা আশা করে আছেন, নবেন্দু শিগগিরই দেশে ফিরবে।

যাই হোক, আমার এ লেখাটা আমি প্রধানত নবেন্দুকে নিয়েই লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিষয়টিতে ব্যাপকত্ব দেবার জন্য এইভাবে শুরু করেছিলাম। লন্ডনে দেখেছি নিতীশ ব্যানার্জিকে, প্যারিসে অমিতা ঘোষাল, বার্লিনে দীপঙ্কর রায়, নিউ ইয়র্কে সত্যেন্দু মজুমদার-এরা আর ফিরবে না। নবেন্দুর নাম বদলে দিয়েছি সত্যেন্দু, অন্যদেরও নাম বদলেছি এবং এরকম অনেককে সত্যিই আমি দেখেছি।

কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব সত্য লেখকদের কলমে আসে না। লেখার নিজস্ব যুক্তিতে কিছু কিছু কল্পনা মেশাতেই হয়। কেউ কেউ বোধহয় ভাবছেন, আমি প্যারিসে অমিতা ঘোষালের ব্যাপারটা বানিয়েছি, তা কিন্তু ঠিক নয়। অন্য নামের ঠিক ঐ রকম একটি বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে প্যারিসে আমার সত্যিই আলাপ হয়েছিল। জার্মানিতে দীপঙ্কর রায়ের কথাটাই আমার একেবারে বানানো। জার্মানিতে আমার যাওয়াই হয়ে ওঠেনি। তবে গোটা জার্মানিতে অনেক বাঙ্গালী ছেলে আছে, তাদের মধ্যে ঐ রকম না ফেরার দলেও কারুর কারুর থাকা সম্ভব, সুতরাং এরকম চরিত্র বানানো দোষের কিছু নয়।

লেখাটা ছাপা হবার পরের দিন একটি ষোল সতেরো বছরের কিশোর এসে আমার সঙ্গে দেখা করল সংবাদ পত্র অফিসে। ছেলেটি ভারী সুশ্রী ও লাজুক। আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ভাল করে কথাই বলতে পারছে না।

একবার শুধু বলল, আপনার অনেক লেখা পড়েছি। বিদেশ সম্পর্কে যেগুলো লিখেছেন, আমাদের বাড়ির সবাই পড়ে।

এ রকম কেউ কেউ আসে মাঝে মাঝে। কথাবার্তা বিশেষ জমে না। আমার লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আমি কোন কথাই বলতে পারি না, শুধু মনে মনে বারবার বলি, ও কিছু না, ও কিছু না।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ছেলেটি বলল আপনি আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন? আমার মা আপনাকে দেখতে চান।

আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত অসামাজিক। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেই কক্ষনো যাই না। অচেনা কারুর বাড়িতে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মন খুলে কথাই বলতে পারি না। এই ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে আমি কি করব?

আমি বললাম, আচ্ছা, যাব একদিন সময় করে।

ছেলেটি বলল, যেতেই হবে কিন্তু।

আমি বললাম, আচ্ছা। যদি সময় সুযোগ পাই–

অর্থাৎ কোন দিন যাব না।

ছেলেটি তার পরদিনই আবার এসে বলল, আমার মা আপনাকে ডেকেছেন। আজই

চলুন।

আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম। মুখে বললাম, আজ? আজ-তো যেতে পারব না, আমার আজ অনেক কাজ।

ছেলেটি হতাশ মুখে বলল, যাবেন না? সবাই আপনার জন্য বসে আছে–

আমি ভাবলাম, এ কি মামার বাড়ির আবদার নাকি? সবাই বসে আছে বলেই আমাকে যেতে হবে? আমার অনুমতি না নিয়ে বসেই বা থাকে কেন। একটু কঠোর ভাবে বললাম, আজ যাওয়া আমার অসম্ভব।

ছেলেটি বলল, তবে কবে যাবেন? কাল?

আমি বললাম, কবে যাব, তা কিছুই বলতে পারছি না।

এর দুদিন বাদে একজন মহিলা আমাকে টেলিফোন করলেন। গলার আওয়াজ শুনলেই মনে হয় প্রৌঢ়া। তবে বেশ মিষ্টি কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, তুমি আমার ছেলের বয়েসী, একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে?

কেন বলুত তো?

এমনিই। তোমার লেখা পড়ি, তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমার যে এখন কয়েকদিন বড্ড কাজ–

কি এমন কাজ, আধ ঘন্টার জন্য ঘুরে যেতে পারবে না? কবে আসবে বল। আজ? কাল? আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব–

মহিলাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতে আমি একেবারেই পারি না। বুঝতে পারলাম, যতদিন না যাব, ততদিন এরা জ্বালাতন করবেন। তার চেয়ে চোখ কান বুজে একবার ঘুরে আসাই ভাল। বললাম, আচ্ছা কাল পরশুর মধ্যেই যাব। আপনাদের বাড়িটা কোথায় বলুন তো?

মহিলা বললেন, আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব, তোমাকে নিয়ে আসবে কালকে।

তোমাকে বাড়ি খুঁজতে হবে না। কালই আসছ তো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ভাই, তুমি কি খেতে ভালবাস বল তো?

আমি একমাত্র ভালবাসি ক্যাম্পিয়ান সাগরের মাছের ডিমের বড়া। মহিলা অবাক হয়ে বললেন, সে আবার কি? সেসব কোথায় পাব?

আমি হেসে বললাম, তার মানে আমি কিছুই খেতে ভালবাসি না। আমি শুধু চা খাব।

পরের দিন ছেলেটি ট্যাক্সি নিয়েই এসেছিল, আমি ওকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চাইলাম, কিছুতেই নিল না। এলগিন রোডের কাছেই ওদের বাড়ি।

এক সুসজ্জিত বসবার ঘর। সেখানে দু-তিনজন মহিলা, চার-পাঁচজন পুরুষ স্থির হয়ে বসে আছেন। আমারই প্রতিক্ষায়।

ঘরে ঢুকেই আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। জড়োসড়ো হয়ে বসলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট সোফায়। যে মহিলা আমায় টেলিফোন করেছিলেন তিনিই প্রথম বললেন, ওমা এ তো সত্যিই ছেলেমানুষ (আট ন' বছর আগেকার কথা), আমি ভেবেছিলাম লেখকদের অনেক বয়েস হয়।

আমি কি আর বলব, লাজুক হাসি দিয়ে মুখ নিচু করে রইলাম। কতক্ষণে এখান থেকে ছাড়া পাব, সেই আমার একমাত্র চিন্তা।

একজন বয়স্ক পুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কতদিন বিদেশে ছিলেন? আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য গিয়েছিলেন? চাকরি না পড়াশুনা?

প্রশ্নগুলো প্রায় জেরার মতন হয়ে যাচ্ছে বলে আমার একটুও পছন্দ হল না। আমি চোখ তুলে বললাম, কোন কারণেই নয়। এমনি ঘুরে বেড়াতে।

মহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, তোমার লেখাগুলো আমরা সবাই পড়ি, তুমি অনেক দেশ ঘুরেছ না?

এরপর চা এল। ক্যাম্পিয়ান সমুদ্রের মাছের ডিম জোগাড় করতে পারেন নি বটে, কিন্তু চার রকমের ফ্রাই ও দু-তিন রকমের মিষ্টি আছে।

অচেনা লোকজনের সামনে খাবার খেতেও আমার ভাল লাগে না। মিষ্টি আমি একেবারেই

পছন্দ করি না। কিন্তু জানি এরপর কি হবে। আমিখেতে চাইব না আর ওরা ঝুলোঝুলি করবেন। একটা অন্তত খাও। খেতেই হবে। এই এক বিরক্তিকর ব্যাপার আমাদের দেশে।

সেই মহিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, দীপঙ্কর তোমার বন্ধু।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোন দীপঙ্কর?

যার কথা লিখেছো?

সবাই অভিযোগ করেন, আমি একটু বেশি লিখি। এ কথা ঠিক প্রায় প্রত্যেকদিনই আমাকে কিছু না কিছু লিখতে হয়। সুতরাং নিজের লেখার সব চরিত্রের নাম মনে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। দীপঙ্কর নামটা বোধহয় আমি নানা লেখায় অন্তত আট দশবার ব্যবহার করেছি। ব্যাক্তিগত জীবনেও আমি চারজন দীপঙ্করকে চিনি। সুতরাং কি করে বুঝব?

মহিলা বললেন, যে দীপঙ্করের সঙ্গে তোমার বার্লিনে দেখা হয়েছিল।

এবার আমি বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই এর ছেলে দীপঙ্কর বিদেশে আছে। কোন চিঠিপত্র দেয় না। লেখা পড়ে এরা ভেবেছেন–

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, দীপঙ্কর রায় বলে আমি কাউকে চিনি না। ওটা বানানো চরিত্র।

বানানো! তুমি যাদের কথা লিখেছ, সবার কথাই বানানো।

না, সকলের কথা বানানো নয়। তবে, ঐ নামটা মানে–

তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে চাইছিলে না কারণ দীপঙ্কর তোমাকে আসতে বারণ করেছে, তাই না?

না বিশ্বাস করুন। আমি। আমি জার্মানিতে কখনো যাইনি।

কোন দেশে না গিয়ে কি সে দেশের কথা লেখা যায়?

জার্মানি সম্পর্কে তো বিশেষ কিছু লিখিনি–সামান্য দু-একটা উল্লেখ–

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি এবার বললেন, আপনি যে জেনিভার কথা লিখেছিলেন আগের সপ্তাহে, সেটাও কি বানানো?

না, জেনিভাতে ছিলাম কয়েকদিন।

দীপঙ্কর তো জেনিভাতেও আসতে পারে, সেখানেও ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়ে থাকতে পারে।

আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল। নিজেই ঐ লেখাকে মিথ্যে প্রমাণ করা যেমন অসুবিধাজনক, তেমনি সত্যি প্রমাণ করাও অসম্ভব। আমার পিঠ দিয়ে ঘাম বইতে শুরু করল। তবে আমার ধারণা ভুল। দীপঙ্কর রায় এই মহিলার ছেলে নন। এদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই।

মহিলা তাঁর ছেলেকে বললেন, রুচিরাকে ডাক না। রুচিরা আসবে না? একটু পরেই একটি যুবতী মেয়ে এসে এ ঘরে ঢুকল। বেশ লম্বা, ছিপছিপে, সুন্দরী ও অহঙ্কারী।

সাবলীল ভঙ্গিতে একটা মোড়া টেনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রৌঢ়া মহিলাটি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। রুচিরা ওদের পাশের বাড়িতে থাকে এই মহিলা রুচিরাকে নিজের মেয়ের মতন স্নেহ করেন।

মহিলা বললেন, এই রুচি তুই ওকে কি জিজ্ঞেস করবি কর না।

মেয়েটি আমার চোখে চোখ রেখে বলল, কেমন আছে দীপঙ্কর?

আমি দীপঙ্করকে চিনি না।

আপনি সত্যি কথা বলতে পারেন। আমরা কেউ কিছু মনে করব না। কে কোথাকার দীপঙ্কর তার জন্য আমাকে এই অস্বস্তিতে পড়তে হবে কেন? আমি মনের খেয়ালে একটা কিছু লিখেছি তার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই। দীপঙ্কর রায় নামটা এতই সাধারণ যে অনেকেরই এই নাম হতে পারে। এমন কি জার্মানিতেও একাধিক দীপঙ্কর রায় থাকা সম্ভব।

রুচিরা বলল, আপনি লিখেছেন, কপালের পাশে কাটা দাগ, এক এক সময় এত বেশি হাসতে আরম্ভ করে যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, এগুলোও কি বানানো?

সত্যিই যে এগুলো বানানো, তা ওদের বোঝাব কি করে। এ হচ্ছে লেখকদের কৌশল, কোন চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য এ রকম কয়েকটা বিশেষত্ব আরোপ করতে হয়। আমি কাউকে দেখে এগুলো লিখিনি, কিন্তু আমার লেখার মতন যদি কারুর চরিত্র হয়, তাতে

আমি কি করতে পারি? আমি বললাম, আমি জার্মানিতে যাইনি। দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে আমার জেনেভাতেই দেখা হয়েছিল। আগে থেকেই ওকে চিনতাম। ও খুব কষ্টে আছে।

ঘরে উপস্থিত সকলের মুখই স্বাভাবিক হয়ে গেল। সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রৌঢ়া মহিলা বললেন, বাবা, তুমি এতক্ষণ তাহলে আমাদের কাছে এ কথা লুকোচ্ছিলে কেন?

আমি কঠোর আদর্শবাদীর মত মুখ করে বললাম, আমি আগে ভেবেছিলাম আপনি দীপঙ্করের মা। মায়ের কাছে ছেলের দুঃসংবাদ কি করে দিই বলুন। তিনি দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, কি হয়েছে দীপঙ্করের?

আমি বললাম, এমন কিছু নয়। আপনি ভয় পাবেন না।

মহিলা বললেন দীপঙ্কর আমার কেউ নয়। এই রুচির সঙ্গে দীপঙ্করের বিয়ে ঠিক ছিল– হঠাৎ দীপঙ্কর দেশ ছেড়ে চলে গেল, চার বছরের মধ্যে একটাও চিঠি পর্যন্ত না– রুচিরার বাড়িতে তো কেউ দীপঙ্করের নামও উচ্চারণ করবে না-আমি এই মেয়েটার কথা যত ভাবি–

রুচিরা বলল, মাসীমা আমাকে বলতে দিন। আচ্ছা সুনীলবাবু আপনি জানেন, ও হঠাৎ কেন এ দেশ ছেড়ে চলে গেল?

আমি বললাম, সবাই যে কারণে যায়। ভাগ্য ফেরাতে। বেশি টাকা রোজগার করতে–

কিন্তু ও তো এখানে ওর থিসিস কমপ্লিট করেনি।

দীপঙ্কর পড়াশুনা করতে যায়নি, চাকরি করতে গেছে।

সে না হয় হল। কিন্তু কাউকে কোন খবর না দেবার কি মানে হয়?

আমি দীপঙ্করের মনের কথা জানি না। বাইরের জীবনের কথা জানি।

সে জীবনটা কি রকম।

খারাপ।

খারাপ মানে?

খারাপ মানে দুঃখের।

রুচির এবং ঘরের সবাই চুপ করে গেল। রুচিরার মুখ হঠাৎ লালচে হয়ে গেছে। ঠিক লজ্জা বা উৎকণ্ঠা নয়, এক ধরনের অপমানবোধেই মেয়েদের মুখের চেহারা এ রকম হয়। রুচিরাকে দেখলেই বোঝা যায় অহংকারী ধরনের মেয়ে। একটি ছেলে কোন কারণ না দেখিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে এই অপমানের জ্বালা সে ভুলতে পারছে না।

এখন এখান থেকে উঠতে পারলে বাঁচি। দীপঙ্কর রায়ের মতন একটা চরিত্রকে সৃষ্টি করা কিংবা ধ্বংস করা আমার পক্ষে ছেলেখেলা মাত্র-কিন্তু রুচিরা নাম্নী এই মেয়েটি কোন গল্পের চরিত্র নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব-এর জীবন ও দুঃখ নিয়ে ছেলেখেলা করা আমার সাজে না। একটু আধটু ভুলেই মানুষের জীবন কত বদলে যেতে পারে।

দুঃখের জীবন বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দীপঙ্কর আমাকে বলেছিল, ভাই, মাসের পর মাস আমি একটাও চিঠি পাই না। প্রত্যেক দিন চিঠির বাক্স দেখি, বিজ্ঞাপনের কাগজ-পত্র এই সব হাবিজাবি থাকে- কিন্তু আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। বিদেশে মাসের পর মাস একজনও চেনাশুনা কারুর চিঠি না পেলে মনের অবস্থা যা সাংঘাতিক হয়.....। ঠিকই এ রকম হয়। কিন্তু আমি দীপঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি কাউকে চিঠি লেখ–

রুচিরা বলে উঠল, ও কাউকে কোন চিঠি লেখে নি কখনো।

ঠিক তাই। ও চিঠি লেখে না অথচ চিঠি পাওয়ার আশা করে। এই ধরনের যার মনের গঠন, তার জীবনটা দুঃখের হবে না?

প্রৌঢ়া মহিলাটি বললেন, তুমি কি বলছ বাবা, বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, আমি এবার উঠি? আমাকে অফিসে ফিরতে হবে।

আর একটু বস। তুমি যে লিখেছ, দীপঙ্কর আর কোনদিন ফিরবে না। কেন ফিরবে না?

তা তো আমি জানি না। ও ফিরতে চায় না। ও বলেছিল, দেশে এমন কেউ নেই, যার জন্য ও ফিরতে পারে। কথাটা বলে আমি আড়চোখে রুচিরার দিকে তাকালাম। রুচিরা পায়ের উপর পা তুলে শক্ত করে বসে আছে। উরুর কাছে শাড়ি প্লেন করছে। আমার খুব রাগ হল। এরা দীপঙ্কর সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেনি। আমি কি আদালতে অন্য কারুর

সাক্ষী দিতে এসেছি নাকি?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললম, চলি।

ওদের বোধহয় আরও অনেক কিছু শোনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমাকে আর বাধা দিতে পারল না।

প্রৌঢ় মহিলা বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। তুমি মাঝে মাঝে এস আমাদের বাড়িতে।

আমি ভদ্রতার হাসি দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই আসব। খুব ভাল লাগল। উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন, আমি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছি। আর কোনদিন আসব না।

সেই কিশোর ছেলেটি ও রুচিরা আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে এল রাস্তায়। মেয়েরা এত অল্প পরিচিত ব্যক্তিকে এমনভাবে এগিয়ে দিতে আসে না। বুঝলাম, রুচিরা আমাকে আরও কিছু বলতে চায়।

রাস্তার মোড়ে কয়েকটি পাড়ার ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল, তারা রুচিরার দিকে তাকাল, তারপর একটু আমাকে দেখল। রুচিরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না, ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে লাগল। একটু এগিয়ে রুচিরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আবার বিদেশে যাবেন?

আমি বললাম, ঠিক নেই। যদি কোন সুযোগ পাই-তবে, আপনাকে আমি দীপঙ্করের ঠিকানা দিতে পারি– আপনি যদি ওকে চিঠি লিখতে চান।

আমি কেন ওকে চিঠি লিখব। কক্ষনো না। একটু থেমে রুচিরা আবার জিজ্ঞেস করল, ও কি ও দেশে গিয়ে বিয়ে করেছে?

আমি নিরীহ মুখে বললাম, আমি অন্তত সে রকম কিছু জানি না। ওখানে কোন মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কিনা সে রকমও কিছু শুনিনি।

ওর সঙ্গে আপনার কদিন দেখা হয়েছিল?

দিন সাতেক।

ও কি রকম আছে?

আপনি কি জানতেন না দীপঙ্কর পাগল ছিল?

রুচিরা দারুণ চমকে বলল, কি?

বড় রাস্তা এসে গেছে, এবার আমি ট্যাক্সি ডেকে অনায়াসেই উঠে পড়তে পারি। কিংবা চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠলেই বা দোষ কি? কিন্তু তার আগে দীপঙ্কর পর্ব শেষ করে দিয়ে যেতে হবে। আমি রুচিরার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, আপনার মন কি শক্ত?

কি হয়েছে ঠিক বলুন তো?

দীপঙ্কর অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আমি যে লিখেছিলাম দীপঙ্কর আর কোনদিন ফিরবে না.. তার কারণ দীপঙ্কর বিদেশের মাটিতে চাপা পড়ে আছে, ফেরার কোন উপায় নেই।

রুচিরার মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, কি হয়েছিল? বিদেশে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই ওর মধ্যে পাগলামি দেখা দেয়। তারপর একদিন আত্মহত্যা করেছে

রুচিরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কঠিন চরিত্রের মেয়ে, ভেঙ্গে পড়ার কোন লক্ষণ দেখলাম না। আমি বললাম আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব? রুচিরা বলল, না।

আমি ট্রামে উঠে পড়লাম।

যে দীপঙ্কর রায়কে আমি সৃষ্টি করেছি, তাকে মেরে ফেলার অধিকার আমার আছে। এই মনগড়া চরিত্রের সঙ্গে যদি অন্য কারুর জীবন মিলে যায় তাতে আমার কি করার থাকতে পারে। ওকে মেরে ফেললে ঘটনা আরও কতদূর গড়াবে কে জানে।

এই ঘটনার বছর তিনেক বাদে মেট্রো সিনেমার সিঁড়িতে আমি রুচিরাকে আর একবার দেখেছিলাম। আমি মেয়েদের মুখ কখনো ভুলি না। রুচিরা আমার দিকে এক পলক তাকিয়েও আমাকে চিনতে পারেনি।

ওর কপালে সিঁদুর, পাশে একজন পুরুষ সঙ্গী। রুচিরার জীবন বদলেছে ও দীপঙ্করকে ভুলে গিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এটা একটা অন্য গল্প-জানি না, এতেও আমার কোন ভূমিকা আছে কিনা।

প্রথম নারী

বেশ দূরে নয়, হয়তো গড়িয়া বা টালিগঞ্জ বা দমদমে কারুর বাড়িতে গেছি। যেখানে এখনো কিছু ফাঁকা জায়গা আছে, গাছপালা আছে, একটা দুটো পুকুর আছে। সে রকম জায়গায় যদি হঠাৎ খুব জোর বৃষ্টি নামে,আমি জানলার কাছে কিংবা ঢাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, চোখ ভরে দেখি হাওয়ার ধাক্কায় গাছগুলোর এলোমেলো নাচ, আর ঘাসভরা মাঠের ওপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ শুনতে শুনতে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার এই রকম একটা বর্ষার দিনের কথা।

প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক বছরই তো বর্ষা আসে। জীবনের যতগুলি বছর আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি ততগুলি বর্ষা ঋতু দেখে যাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্যে কত রকম মনে রাখবার মতন ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু আমার শুধু বিশেষ একটা বর্ষার কথাই মনে গেঁথে আছে।

কত বয়েস হবে তখন আমার, আঠোরো কিংবা উনিশ। ভানু কাকাদের একটা বাড়ি ছিল গালুডিতে। প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় ভানু কাকা আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে। কী কারণে যেন আমাদের যাওয়া হতো না। ভানু কাকার সঙ্গে আমরা কোনোদিনই গালুডি যাইনি। একবারই মাত্র গেছি গালুডিতে, তাও পুজোর সময় নয়। কেন যে গ্রীষ্মকালে ঐ গরমের জায়গায় যাওয়া ঠিক হয়েছিল তা এখন মনে নেই।

ভানু কাকা আমাদের চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন, আর মালির নামে একটা চিঠি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাবা যেতে পারলেন না। বাবার অফিসের গোডাউনে আগুন লেগে গিয়েছিল হঠাৎ তখন তাঁর কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলে না। আমাদের টিকিট পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক হলো, মাকে নিয়ে আমরা ভাইবোনেরা চলে যাবো, বাবা কয়েকদিন পরে আসবেন।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই আমি হয়ে গিয়েছিলাম হেড অপ দ্যা ফ্যামিলি। মা ও ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব আমার ওপর।

গালুডিতে ভানু কাকাদের বাড়িটা বেশ ফাঁকা জায়গায়, ষ্টেশন থেকে অনেকটা দূরে। ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে পেছনে বাগান পাঁচালির ওপাশে ঢেউ খেলানো প্রান্তর। ঐ সব জায়গায় গ্রীষ্মকালে কেউ বেড়াতে যায় না। অনেক বাড়িই তালা বন্ধ ছিল।

সারাদিন কাজ তো কিছুই নেই, বাগানে খানিকটা খেলাধুলো আর নানারকম খাওয়ার চিন্তা। দুপুরে অসহ্য গরম বাতাস, বাইরে বেরুবার উপায় নেই। অত গরমে ঘুমও আসে না। রাস্তায় পোষ্টম্যানের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শুনলেই মনেহতো আজ কি চিঠি আসবে? কিন্তু প্রত্যেকদিন কে চিঠি লিখবে আমাদের? বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, তাঁর আসতে আরও কয়েকদিন দেরি হবে।

বালক থেকে সাবালক পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম বলে আমার সব সময় নতুন কিছু একটা করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু গালুডিনের মতন নির্জন জায়গায় কীই বা করার থাকতে পারে। মাঝে মাঝে ট্রেনে চেপে চলে যেতাম ঝাড়গ্রাম কিংবা ঘটশিলা, কিছু কেনাকাটি করবার জন্য। কেনাকাটি আসল উদ্দেশ্য নয়, গালুডিতেও মোটামুটি সব জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে আমি যখন ইচ্ছে একা একা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারি সেটাই ছিল একটা উত্তেজনার ব্যাপার।

ঐ রকম বয়সে বেশির ভাগ ছেলেই লাজুক হয়। আমি অচেনা লোকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে পারতাম না কিছুতেই। গালুডির তুলনায় ঝাড়গ্রামে লোকজন অনেক বেশি সেখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায় রাস্তায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। ঘাটশিলাতেও একদিন গিয়ে দেখি সুবর্ণরেখার ধারে এক দল ছেলেমেয়ে পিকনিক করতে এসেছে ঐ গরমের মধ্যে। তারা অনেকেই আমার বয়েসী। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি অনেক্ষণ দেখছিলাম ওদের। ওরা খেলছে, হাসিহাসি করছে, নিজেরাই রান্না করছে উনুন ধরিয়ে। বারবার ইচ্ছে করছিল, ওদের দলে মিশে যাই। কিন্তু ওরা আমায় ডাকেনি, ডাকলেও বোধহয় আমি লজ্জায় ওদের সঙ্গে যিাগ দিতে পারতাম না। নিজেকে দারুণ একা মনে হতো।

গালুডিতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি দু-তিনখানা বাড়িই একেবারে ফাঁকা। সেইজন্য আমাদের খুব ডাকাতের ভয় ছিল। সন্ধ্যের পরই দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকতাম ভেতরে। সেইজন্যই সন্ধ্যেগুলো আরও অসহ্য বোধ হতো। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারটি যেমন বুড়ো,

তেমন রোগা, আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম লটপট সিং। ডাকাত কেন সামান্য একটা চোর এলেও বোধহয় ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যেত না।

একদিন বিকেলবেলা আমরা বাইরের বাগানে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম আমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন মহিলা আর একটি বাচ্চা ছেলে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা?

আমি ওদের চিনি না, আগে কখনো দেখিনি। ওরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

আমরা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলাম। এ পর্যন্ত গালুডিতে আর কেউ আমাদের বাড়িতে গেট দিয়ে ঢোকেনি।

আজও আমি সেই দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। একেবারে সামনে রয়েছেন রত্নাদি, নীল শাড়ি পরা বেশ লম্বা চেহারা, পিঠের ওপর চুল খোলা, তাঁর পাশে লাফাতে লাফাতে আসছে পিকলু তার বয়েস সাত বছর, কালো হাফ প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরেছে সে তাদের পেছনে একটু ব্যবধান রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে এলা। যেন তার ভেতরে আসবার ইচ্ছে ছিল না। এলা পরে আছে একটা হরিণ-রঙা শাড়ির। সমস্ত দৃশ্যটা আমার স্মৃতিতে যেন একটা বাঁধানো ছবি, যদিও তখন আমি তাদের নাম জানতাম না।

প্রথম মহিলাটি একেবারে কাছে এসে হাসিমুখে মাকে বললেন, মাসিমা আমায় চিনতে পারছেন? আমি রত্না।

মা তখনও চিনতে পারেননি, কৌতূহলের সঙ্গে একটু একটু হাসি মিশিয়ে চেয়ে রইলেন।

মহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন, সেই যে গড়পারে আমরা–

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ও তুমি রত্না! সত্যি চিনতে পারিনি প্রথমটায়, এসো, এসো! একটুক্ষণ কথাবার্তাতেই সব বোঝা গেল।

আমরা এক সময় গড়পারে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। সে প্রায় দশ বারো বছর আগেকার কথা। আমারই সে বাড়িটার কথা ভালো করে মনে নেই। আমার ছোট বোন তখন জন্মায়নি। রত্নাদিরা থাকতেন পাশের ফ্ল্যাটে। আমাদের থকার সময়েই রত্নাদি নতুন বৌ হয়ে এসেছিলেন সেখানে। সেই টুকুই আমার মনে আছে যে বিয়ের কোনো উৎসব হয়নি, খাওয়া-দাওয়াও হয়নি, তবুও সে বাড়িতে একজন নতুন বৌ এসেছিল। বাড়িতে এবং পাড়াতে সেটা ছিল একটা আলোচ্য বিষয়। আমারও শিশু মনে একটা খটকা লেগেছিল।

শৈলেনদা আর রত্নাদি এক অফিসে চাকরি করতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা রেজিষ্ট্রি বিয়ে সেরে ওরা একসঙ্গে গড়পারের বাড়িতে চলে আসেন।

আমার মায়ের সঙ্গে রত্নাদির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। রত্নাদিদের নতুন সংসার সাজিয়ে দিতে মা সাহায্য করেছিলেন কিছু কিছু। রত্নাদি সেই সব কথাই বলতে লাগলেন উচ্ছ্বাসিত ভাবে।

রত্নাদির বিয়ের পর আমরা ঐ গড়পারের বাড়িতে ছিলাম মাত্র এক বছর। তারপর উঠে যাই ভবানীপুরে। রত্নাদিরাও এখন ঐ বাড়িতে থাকেন না।

রত্নাদি এলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, মাসিমা, এ আমার ছোট বোন, আপনি দু'একবার দেখেছেন ওকে, অবশ্য ও তখন খুবই ছোট ছিল.....

মা বললেন, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়েছে, খুব দুরন্ত ছিল তখন। এখন দেখছি খুব শান্ত!

এলা শুধু শান্ত নয়, প্রায় নির্বাক বলা যায়। একবার শুধু সে মায়ের কোনো একটা প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছিল। সেটা না শুনলে ওকে বোবা মনে হতেও পারতো।

একটু লম্বাটে মতন মুখ এলার, শ্যামলা রং, চোখ দুটি খুব টানা টানা। কালো আর গভীর। চোখ তুলে সে মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকায়, চেয়েই থাকে, কোনো কথা বলে না।

মা রত্নাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরাও এই গরমে এখানে বেড়াতে এসেছো? আমাদের তো পূজোর সময় আসার কথা ছিল, তখন হয়ে উঠলো না, সেই জন্যই তো..... তাও তো উনি আসতে পারলেন না.....

রত্নাদি একটুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, মাসিমা শৈলেন খুব অসুস্থ। আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবো তা জানিনা।

আমি বিষম চমকে উঠেছিলাম। কি শান্তভাবে কথাটা বলেছিলেন রত্নাদি। গলার আওয়াজে কোনো রকম দুঃখ বা উচ্ছ্বাস নেই, যেন জীবনের অনেক ঘটনার মতন এটাও একটা সাধারণ ঘটনা! এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো মানে নেই।

আমরা যে পরিবেশে মানুষ, সেখানে কোনো স্ত্রীকে প্রকাশ্যে তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে শুনতাম না সেই সময়ে। কিন্তু রত্নাদি এমনভাবে শৈলেন কথাটা উচ্চারণ করলেন, যেন সেটা তাঁর

কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম।

রত্নাদির ঐ কথা শুনে এলা এক দৃষ্টিতে তার দিদির দিকে তাকিয়েছিল, কোনো কথা বলেনি। পিকলু তখন একটু দূরে আমার ছোট বোনের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে।

শৈলেনদার যে ঠিক কী অসুখ তা বুঝলাম না। তবে শুনলাম যে উনি শুকনো জায়গায় এলে ভালো থাকেন। রত্নাদি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। পুরো গ্রীষ্মের তিন মাস এখানে কাটিয়ে যাবেন। ওরা এসেছেন দেড় মাস আগে।

মা রত্নাদিদের চা খাওয়ালেন। তারপর ওরা যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন মা আমাকে বললেন, ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে আয় তো নীলু!

রত্নাদি হেসে বললেন, আমাদের এগিয়ে দিতে হবে না।, এতদিনে আমাদের সব চেনা হয়ে গেছে।

তারপরই মন বদলে আবার বললেন, আচ্ছা এসো নীলু আমাদের বাড়িতে চিনে যাবে। মাসিমাকে নিয়ে আসবে একদিন–।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিম দিগন্তে যেখানে আকাশ মিশেছে সেদিকে লালে লাল। আমরা সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। সারা পথ রত্নাদি আমার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। এলা তখনও কোনো কথা বললো না, মনে হয় যেন আমাদের কথা শুনছেন না। মেয়েটা লাজুক না অহংকারী?

রত্নাদিদের বাড়িটা বেশ দূরে। একটা বড় মাঠ পেরিয়ে খুব ফাঁকা জায়গায়। ষ্টেশন থেকে যতদূরে হয়, ততই বাড়ি ভাড়া কমে যায়।

সেদিন আর রত্নাদিদের বাড়ির মধ্যে যাইনি, রত্নাদিও ডাকেননি ভেতরে। হটাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রত্নাদি বলেছিলেন, মাঝে মাঝে চলে এসো, নীলু! আমরা প্রায় সব সময়েই বাড়িতে থাকি। আর হ্যাঁ, শোনো, ভালো কথা মনে পড়ছে। তুমি কি ট্রেনে চেপে ঝাড়গ্রাম যেতে পারবে?

আমি বললাম, আমি তো প্রায়ই যাই।

–একটা ওষুধ আনতে হবে, এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি এনে দিতে পারবে?

আমি তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বললাম, আমি তো কালকেই ঝাড়গ্রাম যাবো বাজার করে আনতে।

–তা হলে তো ভালোই হলো।

সেদিন ওখান থেকে ফেরার পথে আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম মনে আছে। অথচ ভয় পাবার কোনো করণ ছিল না, আমি তেমন একটা ভীতুও নই।

এবড়ো থেবড়ো পাথর ছড়ানো বড় মাঠটা পেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক ঝড় উঠেছিল। চতুর্দিক শোঁ শোঁ শব্দে কেঁপে উঠলো। ঘূর্ণিপাক খেয়ে উড়তে লাগলো দুলো, কোনো দিকে কিছুই দেখা যায় না। আমার মনে হলো, এখন ছুটতে গেলেই আমি দিক ভুল করবো।

মাঠের মধ্যে ঝড় দেখে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। কিন্তু তার একটু আগেই, রত্নাদিদের বাড়ির গেট পেরুবার একটু পরেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে এবারে একটা পরিবর্তন আসছে। আমি সাবালকের জগতে প্রবেশ করেছি, এবার শিগগিরই এমন কিছু ঘটবে যার ফলে বদলে যাবে আমাদের বাকি জীবনের গতি।

এইকথা ভাবতে ভাবতে খানিক দূরে আসার পরই আকস্মাৎ ওরকম ঝড় ওঠায় আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলম। এই যে অন্ধ ঝড়, যার মধ্যে কোনো দিক বোঝা যায় না, এই কি তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক?

যাই হোক, সেই সন্ধেবেলা ঠিকঠাকই বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

রত্নাদি যদি ঝাড়গ্রাম থেকে আমাকে ওষুধ আনাবার কথা না বলতেন, তাহলে হয়তো পরের দিনই আমার ও বাড়িতে যাওয়া হতো না। যদিও আমার তৃষিত মন চাইছিল মানুষের সঙ্গ, কিন্তু রত্নাদিদের বাড়িতে যাবো কি যাবো না তা ভেবে ভেবে মন ঠিক করতে আমার দু'তিন দিন লেগে যেত।

ওষুধ নিয়ে পৌছোবার পর সেদিন দেখলাম শৈলেনদাকে। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতিতে শৈলেনদাকে মনে ছিল একজন শক্ত সামর্থ পুরুষ হিসেবে। এখন দেখলাম বিছানার সঙ্গে একেবারে লেগে যাওয়া একজন কঙ্কালসার মানুষ। একটানা দু'তিন মিনিট কথা বলতে পারেন না, তারপরই দারুণ হাঁপানি ওঠে।

তবু আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি অন্য কারণে। শৈলেনদা একবারও তাঁর অসুখের কথা বলেন না। মুখে ব্যথা-বেদনার কোনো চিহ্ন নেই। অত হাঁপানির মধ্যেও একটু সুযোগ পেলেই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, নিজেও হেসে ওঠেন। এরা অন্য ধরনের মানুষ।

রত্নাদি আমার পরিচয় দেবার পর শৈলেনদা বললেন, ও হ্যাঁ, মনে আছে---তোমার বাবা তো

ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, সেই সকালে বেরুতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাদা, আপনি আপনার ছেলেদের কারুকে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবেন? হা-হা-হা!

সেদিন রত্নাদি আমায় বলেছিলেন, নীলু, তুমি কি রোজ বাজারে যাও? তাহলে আমাদের কিছু আলু আর পেঁয়াজ এনে দেবে? অনেকটা দুর তো, তাই আমরা রোজ বাজারে যাই না। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না হয়.....

কয়েকদিন পরে বোঝা গেল, আমি যে শুধু আমাদের বাড়িরই হেড অব দা ফ্যামিলি তাই-ই নয়,রত্নাদিরাও অনেক ব্যাপারে আমার ওপরে নির্ভর করেন। উনিশ বছর বয়েসে দুটি সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর। সকাল-বিকেল দু'বেলাই আমার রত্নাদিদের বাড়িতে যেতে হয়। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারের একটি সাইকেল ছিল, আমি ব্যবহার করতে লাগলাম সেটা, ফলে অনেক সুবিধে হয়ে গেল।

অনেক গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, মধুপুর বা শিমুলতলার মতন জায়গায় বেড়াতে গেলে উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রেমের ব্যাপার হয়ে যায়। সেটা খানিকটা মধুর বিরহে শেষ হয়। কিন্তু এলার সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। এলা প্রায় আমারই বয়েসী, কলেজে সে আমার চেয়ে এক ইয়ার নিচে পড়ে, আমাদের মধ্যে প্রেম না হোক বেশ একটা বন্ধুত্ব হওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। আমার দিক থেকে ইচ্ছেও ছিল যথেষ্ট। তবু সে রকম কিছু হয়ে উঠলো না।

এলা সত্যিই বড় কম কথা বলে। ওদের বাড়িতে যখনই যেতাম, দেখতাম সে কোনো বই নিয়ে বসে আছে। রান্না ঘরে তাকে রান্না করতে, কুয়ো থেকে জল তুলতেও তাকে দেখেছি। কিন্তু তার বই হাতে নিয়ে বসে থাকা ছবিটাই বেশি মনে পড়ে।

এলা যে আমার সঙ্গে একেবারে কথা বলতো না তা নয়। চা খাবেন? বা, আপনাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে? এই ধরনের মামুলি কথা সে বলতো ঠিকই, কিন্তু তার মনটাকে সে যেন রেখেছিল একটা খড়ির গন্ডি দিয়ে ঘিরে, যার মধ্যে সে কারুকে প্রবেশ করতে দেবে না। অনেক সময় কোনো কথা না বলে সে শুধু আমার চোখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো, সেটাই আমার অদ্ভুত লাগতো। মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকায় না!

পরের শনিবার কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হলো অজিতদা আর সুকোমলদা। এদের মধ্যে অজিতদা হলো রত্নাদির ছোটভাই আর সুকোমলদা তার বন্ধু। শৈলেনদার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই, রত্নাদির বাড়ির লোকরাই মাঝে মাঝে ওদের দেখাশুনো করতে আসে। পনেরো দিন অন্তর একবার। শনিবার বিকেলে এসে সোমবার চলে যায়।

যদিও ওরা আসে অসুস্থ শৈলেনদার খোঁজ-খবর নিতে, কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে একটা বাইরে বেড়াতে আসার মেজাজ থাকে। বাড়িটা হৈ-হল্লায় সরগরম হয়ে ওঠে। বাগানে মুরগি কাটা হয়। সন্ধের পর সুকোমলদার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে রামের বোতল। এমনকি শৈলেনদাকেও সেই রাম খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল, দু'চুমুক দিয়েই শৈলেনদা দারুণ কাশতে শুরু করেছিলেন।

সুকোমলদা সদ্য ডাক্তারি পাস করে হাউস সার্জেন হয়েছে তখন, এই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে এসে তার চালচলন বিধান রায়ের মতন। শৈলেনদার বুক পিঠ পরীক্ষা করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, শুনুন, জামাইবাবু, আমি যা বলছি তা যদি ঠিকঠাক মেনে চলেন, তা হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে খাড়া করে দেবো!

শৈলেনদা হেসে বলেছিলেন, ওরে, অনেক টাকা খরচ করে অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। আমি কি ছেলেমানুষ যে আমাকে মিথ্যে স্তোক বাক্য দিয়ে ভোলাবি? এখানে এসেছিস, একটু আনন্দ ফুর্তি কর। কাল তোরা সবাই মিলে চিল্‌কিগড় ঘুরে আয় না!

প্রথম দিন গালুডিতে পৌঁছোবার এক ঘন্টা বাদেই আমি দেখেছিলাম, সুকোমলদা এলাকে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি না হয় খুব লাজুক কিন্তু সুকোমলদা তো গল্পের বাইরের চরিত্রের মতন, স্বাস্থ্য ভালো ডাক্তারি পাস করেছে, পরিপূর্ণ সার্থক একজন যুবক। সে এলার মতন একজন যুবতী মেয়েকে দেখলে প্রেম না হোক একটু ফষ্টিনষ্টি তো করতে চাইবেই। আমার সামনেই সুকোমলদা এলার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো, এই মেয়েটা এত লাজুক কেন? কথাই বলে না!

সেদিন আমি ও বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকিনি।

পরের দিনও সকালে ও বাড়িতে যাইনি অন্যদিনের মতন। বাজার-টাজার করবার জন্য আর তো আমার প্রয়োজন হবে না, দুজন শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষই তো এসে গেছে।

বিকেল বেলা অজিতদা আর সুকোমলদা পিকলু আর এলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। মার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলো। তারপর সুকোমলদা আমাকে বললো, নীলু, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমরা একটু বেড়াবো।

এ কথা ঠিক, সুকোমলদা কক্ষনো আমার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি। আমাকে সে

প্রতিযোগী হিসেবে ভাবেনি মোটেই। সে কথা সে ভাববেই বা কেন, আমি তো এলার প্রেমিক ছিলাম না, এমনকি বন্ধুও হতে পারিনি। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় সুকোমলদা তার কাঁধ জড়িয়ে ধরতো, আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করতো না। বোধহয় আমাকে মনে করত ছেলেমানুষ।

এলা কিন্তু সুকোমলদাকে দেখে গদগদ হয়ে যায়নি। স্বভাব পাল্টায়নি সে।সুকোমলদার মতন একজন আকর্ষনীয় ও উৎসাহী যুবককে দেখেও প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠেনি সে। সুকোমল তার কাঁদ জড়িয়ে ধরলে সে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। রেগে চ্যাঁচামেচিও করেনি, আবার প্রশ্রয়ও দেয়নি।

গালুডিতে আমাদের থাকার কথা ছিল কুড়ি একুশ দিন। আমার ছোট ভাইবোনরা দশ-বারোদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ঐ বয়সে প্রকৃতি বেশি ভালো লাগে না। বন্ধু–টন্ধুর অভাবেই ওরাচঞ্চল হয়ে পড়েছিল। রোজই বায়না ধরতো, মা, আর ভালো লাগছে না। এবারে ফিরে চলো!

মা বলতেন, এত খরচ-পত্তর করে আসা, এর মধ্যেই ফিরে যাবি কী রে! দাঁড়া, আগে তোদের বাবা আসুক। এখানকার জল খাবার ভালো–।

আমাকে দারুণ চমকে দিয়ে এলা বললো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, আমার..... আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ

বলো।

আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুটি মেলে এলা চুপ করে রইলো। অন্ধকারের মধ্যেও যেন আমি দেখতে পেলাম তার কালো চোখের গভীরতা। এই রকম ভাবে পল, অনুপর খরচ হতে কত সময় কেটে গেল কে জানে!

একসময়ে অজিতদা এলা, এলা, তোকে সুকোমল ডাকছে, এই বলে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমরা দু'জনেই মুখ ঘোরালাম সেদিকে। অজিতদা নিরীহ, ভালোমানুষ ধরনের, তার বন্ধুরা কিসে খুশি হয় তাই দেখার জন্যই সব সময় সন্ত্রস্ত।

এলা আমাকে বললো, আজ থাক। তুমি কাল আসবে? কাল সকালে ওরা চলে গেলে, তারপর বলবো। ঠিক এসো–

সে রাতে কি আমি ঘুমোতে পেরেছিলাম একটুও? শুধু বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি। চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠেছে গেটের কাছের সেই দৃশ্যটা। এলা কি ওখানে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল? এতদিন বাদে সে একসঙ্গে অতগুলো কথা বলেছিল, যেন সেই মুহূর্তে সে খাড়ির গন্ডিটা মুছে দিয়ে কাছে ডেকেছিল আমাকে।

আসলে রাত্তিরে বিছানায় শুলে সকলেই কোনো এক সময় আরামের আমেজ লাগে। অন্যান্য দিন সকাল ন'টার মধ্যেই চচ্চড়ে রোদে একেবারে ঝলসে যেত চারদিক। আজ সজল স্নিগ্ধ রঙে ছেয়ে আছে পৃথিবী। গাছপালাগুলো আজ রুক্ষ মাটি হ্যাংলার মতন চোঁ চোঁ করে টেনে নিচ্ছে বৃষ্টির পানি।

আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি বটে কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সব সময় বেজে চলেছে একটা দামামা। এলা আমাকে কিছু বলবে! এলা আমাকে কিছু বলবে!

কী বলবে এলা? এমন কোনো কথা, যা অজিতদার সামনে বলা যায় না! অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায়? আমি কি এতখানি যোগ্য! এর আগে তো সে একবারও অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলেনি আমার সঙ্গে। মাঝ মাঝে শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকেছে, আমি কি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারিনি?

বৃষ্টি থামলো সাড়ে ন'টার পর। এখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। মনটা যদিও ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু আরও একটু ক্ষণ অপেক্ষা করাই ঠিক করলাম। দশটার পর অজিতদারা বেরিয়ে ট্রেন ধরতে যাবে। এখন গোছগাছ চলছে, এই সময় গিয়ে পড়লে কোনো কথাই হবে না। তাছাড়া সুকোমলদা হয়তো আমাকে ষ্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। আগেরবার তাই করেছিল। থাক আর একটু দেরী করে যাওয়াই ভালো, অজিতদারা বেরিয়ে পড়ুক বাড়ি থেকে। এলাও সেই কথাই বলেছিল, ওরা চলে গেলে–

আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই ট্রেন লাইন গেছে, কখন কোন ট্রেন যায় আসে আমরা আওয়াজ শুনতে পাই। কলকাতার ট্রেনের জন্য কানখাড়া করে রাইলাম।

তার মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো ঝেপে। এবারে আর বড় বড় ফোঁটা নয়, এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে, তার সঙ্গে স্লেট-এর মতন আসছে বৃষ্টি । এরই মধ্যে ঝমঝামিয়ে চলে এলো কলকাতার ট্রেন। বাড়িতে ছাতা বা রেইন-কোট নেই, কিন্তু একদিন বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু আসে যায় না।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বললাম, মা আমি একটু বেরুচ্ছি।

মা বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে? কোথায় যাবে? বললাম যে আজ বাজারে যাওয়ার দরকার নেই।

ডিমের ঝোল করে দেবো।

–একটু রত্নাদিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো।

–এই বৃষ্টি মাথায় করে? কালই তো মাঝরাত্তির পর্যন্ত সেখানে ছিলি! আজ সকালেই আবার যেতে হবে কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। কাল অত রাত করে ফেরার পর আজ সকালেই আবার ছুটে যাওয়ার কী যুক্তি আমি দেখাবো?

আমি এখন হেড অফ দা ফ্যামিলি। যখন যেখানে খুশি যেতে পারি। এর আগে মায়ের কাছে কোনো যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু রত্নাদিদের বাড়ির কথা একবার বলে ফেলে একটা দারুণ লজ্জা আমায় ছেয়ে ফেললো– কেন সেখানে যেতে চাই তা মাকে বলা যাবে না।

চুপ করে বসে রইলুম বারন্দায়। কিন্তু বৃষ্টির রূপ দেখার মন আমার নেই। এই বৃষ্টি আমার অসহ্য লাগছে। আগে কোনোদিন আমার বৃষ্টির ওপর এতরাগ হয়নি।

অজিতদাদের ট্রেন ধরতে হবে, তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি। এতক্ষণে বাড়ি ফাঁকা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রত্নাদি রয়েছেন রান্না ঘরে, পিকলু বারান্দায় খেলছে, আর এলা একটা বই সামনে নিয়ে বসে আছে। নিশ্চয়ই সে বারবার চোখতুলে দেখছে গেটের দিকে। সামান্য বৃষ্টির জন্য আমি তার কাছে যাইনি। নিশ্চয়ই সে আমাকে কাপুরুষ ভাবছে।

এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে কিছু না বলে ছুটে চলে যাই। কিন্তু বৃষ্টি আর হাওয়ার বেগ দুটোই বেড়েছে। এর মধ্যে বিনা কাজে বেরুনো খুবই অস্বাভাবিক। আমি তো সেরকম গোঁয়ার বা অবাধ্য ধরনের ছেলে ছিলাম না।

সেই বৃষ্টি থামলো প্রায় পৌনে একটায়। মা তখনই আমাকে খেতে ডাকলেন। এই সময়ে কারুর বাড়িতে যাওয়াও ঠিক নয়। বারোটা থেকে তিনটে, এই সময় অযাচিতভাবে কেউ কারুর বাড়ি যায় না। এরকম একটা অলিখিত নিয়ম আছে। ও বাড়িতে গেলে রত্নাদিই হয়তো আমাকে প্রথম দেখবেন, একটু অবাক হয়ে তাকাবেন। কিংবা, দুপুরবেলা ও বাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে, আমি দরজা ধাক্কা দিলে ঘুম থেকে উঠে এসে রত্নাদি জিজ্ঞেস করবেন, কী ব্যাপার?

আড়াইটের সময় আবার বৃষ্টি ফিরে এলো। এবারে বেশ হাল্কা, ঝিরঝিরে। কে বলবে গত কাল দুপুরেই এ অঞ্চলে কী প্রচন্ড গরম ছিল, এখন বেশ ঠান্ডা শিরশিরে ভাব।

জানালার পাশে এসে আমাদের কেয়ার-টেকার লটপট সিং জানালো, এরকম সারাদিন ধরে বৃষ্টি এ অঞ্চলে সাধারণত হয় না। এ যেন বাঙ্গাল বারিষ-এর মতন!

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, বৃষ্টি থামুক বা না থামুক, ঝড়-বজ্রপাত যা কিছু শুরু হোক, তিনটে বাজলেই আমি বেরিয়ে পড়বো।

মা আমি যাচ্ছি! বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি চলে এলাম গেটের বাইরে। বৃষ্টি থামেনি। জোরও হয়নি। সাইকেলটা নেবার কথা মনে পড়েনি। আমাদের বাড়ির রাস্তাটুকু ছাড়াবার পরেই আমি দৌড় শুরু করে দিলাম। অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এলা আমাকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে কথা আছে। এখনো নিশ্চয়ই সে আমার অপেক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে।

রত্নাদিদের বাড়ির কাছ এসে দেখলাম গেটটা হাট করে খোলা। ভেতরের দরজাটাও খোলা। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কী যেন একটা কিছু ঘটেছে। তারপর লক্ষ্য করলাম বাগানের মধ্যে একটা ট্রাক দাঁড় করানো। আমি গেটের কাছে এসে পৌছতেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অজিতদা। একি, অজিতদারা যায়নি সকালের ট্রেনে! কেন?

আজিতদা আমাকে দেখে বললো, তুমি এসে পড়েছো? তোমাদের বাড়িতে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলাম।

একটু থেমে, মাটির দিকে চোখ করে, নিচু গলায় বললে, সাড়ে দশটার সময় শৈলেনদা মারা গেছেন!

আমার উনিশ বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় শোক অনুভব করছিলাম সেই মুহূর্তে। শৈলেনদার জন্য নয়। একটা মৃত্যুর বাড়ি, এখানে অন্য কোনো কথা হবে না। এলা আমাকে তার সেই কথাটা বলতে পারবে না।

সাড়েদশটার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে, কান্নাকাটির পালাও চুকে গেছে। এখন সবাই নানা রকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। রত্নাদিকে অন্যদিনের মতনই শক্ত দেখলাম। তিনি জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছেন। সন্ধ্যের আগেই ওঁরা ট্রাকে করে সবাই মিলে রওনা হবেন কলকাতার দিকে। কী একটা ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে শৈলেনদার দেহ কলতায় নিয়ে গিয়ে পোড়ালেই সুবিধে হবে।

আমি এক ফাঁক বেরিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এলাম এ বাড়িতে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বাগানে। আমার আর কিছুই করার নেই। এলার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। তার দৃষ্টির

ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। তাতে কি ভর্ৎসনা ছিল? কিংবা, এলা কাল রাতের কথা ভুলে গেছে? আমাকে সে তার কিছু বলতে চায় না?

বাবা আসবেন আসবেন করেও আসতে পারছিলেন না। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, থাকো আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও।

এক পক্ষ কাল ঘুরে যাবার পর অজিতদা আর সুকোমলদা আবার এলো কলকাতা থেকে। এবারে সঙ্গে আর একজন বন্ধু, তার নাম সৌমিত্র। সে খুব ভালো গান করে। শনিবার সন্ধ্যেবেলা বসলো গানের আসর। পরের রবিবার পূর্ণিমা ঠিক হলো সেদিন বাগানে চাঁদের আলোয় পিকনিক হবে। সুকোমলদা আমাকে বললো, নীলু, তুমি বাড়িতে বলে আসবে,কাল রাতে তোমার ফেরা হবে না। বেশি রাত হয়ে যাবে, তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে। কিংবা আমরা সারা রাতই জাগতে পারি।

মা অবশ্য আমার বাইরে রাত কাটানোর প্রস্তাবে রাজি হননি। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, ডাকাতির ভয় আছে। আমাদের বাড়িতে আর কোনো পুরুষ মানুষ তো নেই। মা বলেছিলেন, এগারোটার মধ্যে ফিরে আসিস।

রত্নাদিও রাত্তিবেলা বাগানে পিকনিক করার ব্যাপারটা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। সন্ধ্যের দিকে তিনি বলছিলেন, অজিত, তোরা বরং সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যা না। জানিস তো, তোর জামাইবাবু এইসব হই-চই কত ভালবাসতো। এখন নিজে জয়েন করতে পারে না। ঘরে শুয়ে শুয়ে সব আওয়াজ শুনবে, ওর খারাপ লাগবে।

এ কথ শুনে সুকোমলদা সহাস্যে বলেছিল, তুমি বলছো কী, মেজদি! এই ব্যাপারটা আমরা ভাবিনি? জামাইবাবুর অসুখটা তো বেশির ভাগই সাইকোলজিক্যাল। আজ ওকেও আমরা পিকনিকে নিয়ে আসবো। বাগানে খাটে শুয়ে থাকবে।

শৈলেনদা সব শুনে উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ আমি বেশ ভালো আছি। কতদিন খোলা আকাশের নিচে শুয়ে চাঁদের আলো দেখিনি। আমি যাবো–

কেন যেন সেই পিকনিকে আমি খুব আনন্দ পাইনি। শৈলেনদা বারবার কাশছিলেন। সুকোমলদা আর সৌমিত্রদা রামের বোতল আর গান নিয়ে নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে রইলো। একবার তারা এলাকে খুব পীড়াপিড়ি করতে লাগলো গান গাইবার জন্য। এলা কিছুতেই গান গাইবে না। ওরা এলার হাত ধরে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দিল ঘাসের ওপর। এলা মুখ গোঁজ করে রইলো তবু। আমার মনে হলো, কয়েকজন অত্যাচারী পুরুষ এলাকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আমি কী করবো। আমি তো এলার প্রেমিকও নই, বন্ধুও নই।

রাত সাড়ে দশটার সময় আমি উঠে পড়লাম। অন্য কারুর কাছে বিদায় নেবার কোনো দরকার নেই, আমি শুধু রত্নাদিকে বললাম, আমি যাচ্ছি রত্নাদি, মা চিন্তা করবেন। রত্নাদি একটুও আপত্তি করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, যাও। তোমার কাছে টর্চ আছে তো নীলু?

গেটের কাছে এসে দেখি সেখানে এলা দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছিল কী? কী জানি, আমি তার চোখ দেখিনি। জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কোনো মেয়ের মুখের ওপর টর্চও ফেলা যায় না।

ওদের ট্রাক গালুডি ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথম জল এলো আমার চোখে। জামার হাতায় যতবার চোখ মুছি তবুও কান্না থামে না।

তারপর আর কোনদিন এলাকে দেখিনি। রত্নাদি কোথায় থাকেন জানি না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা ওরা বোধ করেননি। সেইটাই তো স্বাভাবিক।

আমার জীবনে সেই প্রথম একটি নারী আমাকে বলেছিল, আমাকে সে নিরালায় কিছু জানাতে চায়। কী বলতে চেয়েছিল এলা? আমি কিছুতেই তা অনুমান করতে পারি না আজও। হয়তো খুবই সাধারণ কোনো কথা। বোধহয় কোনো বই চাইতো। কিন্তু অজিতদাকে দেখে থেমে গিয়েছিল কেন?

সেই কথাটা শোনা হয়নি, এলাকে আর কখনো দেখিনি, তাই আজও আমার জীবনে একটা শূন্যতাবোধ রয়ে গেছে। বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে, শূন্যতাবোধটা আরও বেড়ে যায়, জানা হয়নি। একজন নারীকে, সে কিছু বলতে চেয়েছিল, আমার শোনা হয়নি।

সমাপ্ত